লাল চিঠি
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

লাল চিঠি-৭০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠলো বনহুর—খাটিয়া শূন্য, জংলীরাণী নেই তবে সে গেলো কোথায়? অপর খাটিয়ায় হুসনা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর ভাবলো জংলীরাণী চলে গেছে। কিংবা সে সমুদ্র তীরে গিয়ে থাকবে। তাই সে বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে। তাকালো সম্মুখে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে। বেলাভূমি ধূ-ধূ করছে। দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের দূরে বহু দূরে কিন্তু কোথায় জংলীরাণী।

বনহুর ফিরে এলো কুটিরের মধ্যে।

নিজের খাটিয়ায় বসে ভাবলো কিছুক্ষণ।

এমন সময় হুসনা জেগে উঠলো, চোখ মেলেই দেখতে পেলো বনহুরকে। গহ রাতের জংলীরাণীর কথা মনে পড়তেই অভিমানে ভরে উঠলো তার মন।

ইচ্ছা থাকলেও কথা বললো না হুসনা।

বনহুর হুসনার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো, সে আপন ইচ্ছায় বললো—মিস হুসনা, ও চলে গেছে।

হুসনা অভিমানভরা গলায় বললো—তাকে যেতে দিলেন কেন, ধরে রাখলেই পারতেন?

বনহুর একটু হেসে বললো—মিস হুসনা, আপনি যা বললেন সে জন্যই তাকে এনেছিলাম কিন্তু রাখতে পারলাম কই। জংলীরাণী আবার ফিরে গেছে তার জংলী বাবা-মার কাছে।

হুসনা বললো—আপনি ইচ্ছা করলেই আবার তাকে আনতে পারবেন।

পূর্বের মতই হাস্যোজ্জল কণ্ঠে বললো বনহুর—হয়তো চেষ্টা করলে পারবো।

চেষ্টা আপনাকে করতে হবে না মিঃ চৌধুরী, সে মনের টানেই চলে আসবে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নেয় হুসনা, তারপর বলে—জংলীরাণীর হৃদয় আপনি জয় করে নিয়েছেন, কাজেই..চুপ করে যায় হুসনা।

বনহুর বলে—বলুন, চুপ করলেন কেন?

কাজেই সে আর আপনাকে ছাড়া কোথাও থাকতে পারবে না। একটু থেমে বলে আবার হুসনা—তাছাড়া আপনি নিজেও জংলীরাণীকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না....

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলো হুসনার মুখে ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত করে বললো—তার মানে?

মিঃ চৌধুরী, আপনি যতই লুকোতে চেষ্টা করুন না কেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন...কথা শেষ না করেই থেমে যায় হুসনা এবং কুটির থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

বনহুর বলে উঠে—শুনুন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হুসনা কিন্তু সে বনহুরের দিকে তাকায় না। চোখ দুটো নত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর বলে—মিস হুসনা, আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বুঝে আর কাজ নেই।

শুনুন। আপনি যা মনে করেছেন তা সত্য নয়। কারণ জংলীরাণীকে সভ্য মানুষে পরিণত করাই আমার ইচ্ছা। তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, এটা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন? মিস হুসনা, জংলীরাণী সম্বন্ধে আপনাকে সব বলেছি, এরপরও আপনার মনে এ ধরনের চিন্তার উদ্ভব হওয়া সম্পূর্ণ অহেতুক মনে রাখবেন।

হুসনার চোখ দুটো আপনা আপনি যেন ঝাপসা হয়ে আসছিলো, সে আর দাঁড়াতে পারে না, ছুটে বেরিয়ে যায়। কুটিরের পিছনে গিয়ে বালির মধ্যে বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। হুসনার এ দ্বীপে মিঃ চৌধুরী ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। মিঃ চৌধুরীই তার সবকিছু, কাজেই জংলীরাণীকে নিয়ে মিঃ চৌধুরী সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তাও নিছক মিথ্যা নয়। হুসনা জানে, মিঃ চৌধুরী আগে যেমন ছিলো এখন ঠিক তেমন নেই। তার মধ্যে এসেছে বিরাট একটা পরিবর্তন। আগের মত হুসনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে না, সমুদ্র তীরে গিয়ে বসে হাসি গল্পে মেতে উঠে না, ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে না। হুসনা গত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে আরও বেশি উতলা হয়ে পড়ে।

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়। বনহুর জংলীরাণীকে সভ্য করার জন্য যখন থেকে শপথ নিয়েছিলো তখন থেকে সে বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। শুধু হুসনার প্রতিই নয়, সব কাজেই সে উদাসীন ছিলো।

জেলে বাবা কিংবা অন্য কেউ এ ব্যাপারে তেমন চিন্তা না করলেও হুসনার মনে নাড়া দিয়েছিলো বনহুরের অন্যমনস্ক ভাবটা। তাই হুসনা ব্যথাও পেয়েছিলো মনে মনে অনেক।

বেশ কিছুক্ষিণ নীরবে কাঁদলো হুসনা।

এ দ্বীপে সে যেন নিজকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অসহায় মনে করছিলো মিঃ চৌধুরী যেন হারিয়ে গেছে তার কাছ থেকে। অকূল সাগরে ভাসছে হুসনা, কেউ যেন তাকে তুলে ধরার নেই।

হুসনা কুটির থেকে বেরিয়ে যেতেই বনহুর বেরিয়ে এসে জেলে বাবার খোঁজ করে।

জেলে বাবা তখন তার কুটিরের সম্মুখে দাড়িয়ে খাটিয়ায় হুকা টানছিলো। সম্মুখে জাল এবং মাছের ঝুড়ি। অবশ্য ঝুড়িতে এখন মাছ নেই, মাছ ধরে রাখার জন্যই এ সব ঝুড়ি তারা ব্যবহার করে থাকে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো—জেলে বাবা!

মুখ তুলে তাকালো জেলে বাবা—কে, বাবু?

হাঁ। জেলে বাবা কাল রাতে জংলীরাণী ছিলো কিন্তু সকাল বেলা তাকে তার খাটিয়ায় দেখতে পাইনি। সে কোথায় গেছে বলতে পারো?

হুকোটা নামিয়ে রাখে বলে জেলে বাবা—হয়তো জঙ্গলে গেছে বাবু।

বাবু, সে এখনও তেমন মানুষ হয়নি, হলে বলেই যেতো।

কিন্তু সে হঠাৎ চলে গেছে, যাবার সময় বলে গেলো না।

বনহুর ভাবে, জেলে বাবা ঠিকই বলেছে। জংলীরাণী এখনও তেমন মানুষ হয়নি, হলে তাকে না বলে সে যেতো না বা যেতে পারতো না।

জেলে বাবা বলে—বাবু, তুই ভাবিস না, ও ঠিক আবার এসে পড়বে দেখে নিস। চল্ বাবু মাছ ধরতে যাই?

তোমরা যাও জেলে বাবা, আজ আমি যাবো না।

জেলে বাবা তার জাল হাতে নিয়ে উঠে পড়ে। বনহুর চলে যায় তার নিজের কুটিরের দিকে।

কুটিরের দিকে এগুতেই নজর পড়ে কুটিরের পেছনে জলপাই গাছের তলায় হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে হুসনা।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকায়, তারপর সে ধীরে পদক্ষেপে এগিয়ে যায় হুসনার পাশে।

হুসনা পদশব্দ শুনতে পেলেও মুখ তোলে না।

বনহুর পাশে বসে পিঠে হাত রেখে ডাকে—মিস হুসনা।

বনহুরের স্পর্শে হুসনার কান্নার বেগ আরও বেড়ে যায় যেন। কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে তার শরীরটা।

বনহুর বলে—আপনি এখানে এভাবে বসে কাঁদছেন। ঠিক বুঝতে পারছি না কি হয়েছে আপনার?

হতাশ হয়ে পড়েলো সবাই।

বনহুর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে, কারণ জংলীরাণী যে রাতে নিরুদ্দেশ হয় সে রাতে সে তারই কুটিরে তারই খাটিয়ায় ঘুমিয়ে ছিলো।

সন্ধ্যায় বৈঠক বসলো জংলীরাণীর নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়ে। জেলে বাবা এবং জংলী সর্দার রয়েছে সেখানে আর রয়েছে বনহুর নিজে।

অন্যান্য জেলের দল এবং জংলীরাও বসে আছে তাদের চারপাশ ঘিরে। সকলের চোখেমুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ছে।

বনহুর বললো—জংলী সর্দার এবং জেলে বাবা, আমি এ দ্বীপে আসার পর থেকে দেখেছিলাম জেলে আর জংলীদের মধ্যে বিরাট একটা কাটাকাটি ভাব। প্রায়ই জংলীরা নিরীহ জেলেদের উপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করতো জেলেদের। ছোট একটা দ্বীপ কুন্দল। বাইরের জগতের সঙ্গে এই দ্বীপটার নেই কোনো সম্বন্ধ। জংলী আর জেলেরাই হলো এ দ্বীপের হর্তাকর্তা। এখানে যদি এরাই সব সময় কাটাকাটি-মারামারি নিয়ে থাকে তবে কোনোদিন এ কুন্দল দ্বীপে শান্তি আসবে না। তাই আমি এই দুটি জাতির মধ্যে চেয়েছি মিলন ঘটাতে। দীর্ঘ বারোটি মাসের অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। জেলে ও জংলীদের মধ্যে আমি বন্ধুত্বভাব জমাতে সক্ষম হয়েছি।

থামলো বনহুর।

জেলে বাবা এবং জংলী সর্দার মনোযোগ সহকারে শুনছিলো বনহুরের কথাগুলো। শুধু তারাই নয়, তাদের দলবল সবাই শুনছিলো। যদিও জংলীরা বনহুরের কথা সবগুলো বুঝতে পারছিলো না তবু ওরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিলো।

একপাশে বসেছিলো হুসনা।

বনহুর বলে চলেছে—আমি আশা করছি এ বন্ধুত্ব ভাব তাদের মধ্যে চিরদিন বজায় থাকবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না জংলীরাণী গেলো কোথায়। আমার উদ্দেশ্য ছিলো জংলীরাণীকে মানুষ করা। সে আজ মানুষ হয়েছিলো, কিন্তু...বনহুরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে নিজের অজান্তে। দারুণ একটা ব্যথা বনহুরের হৃদয়কে জর্জরিত করে তোলে। জংলীরাণীর সঙ্গে জড়িত স্মৃতিগুলো একের পর এক মনে হতে থাকে। নিজকে যেন বনহুর সংযত রাখতে পারে না, উঠে বেরিয়ে যায় সেখান থেকে।

হুসনার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

বনহুর চলে যেতেই সেও উঠে দাঁড়ায়।

বনহুর বাইরে আসতেই চুমকী খিল খিল করে হেসে উঠে—বাবু, জংলীরাণীকে আর তুই খুঁজে পাবি না....তারপর হাসতে হাসতে ছুটে চলে যায় সে।

বনহুর চুমকীর দিকে তাকিয়ে কিছুটা অবাক না হয়ে পারলো না, কারণ সে হঠাৎ এভাবে হাসছে কেন। আর জংলীরাণীকে কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, এ কথাই বা সে বললো কেন।

বনহুর নিজের ঘরে এসে এ কথাই বসে বসে ভাবছে, এমন সময় হুসনা এসে দাঁড়ায় তার পাশে বলে সে—মিঃ চৌধুরী, আপনি একটি জংলী মেয়ের জন্য এমন করে ভেংগে পড়বেন ভাবতে পারিনি।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরে হুসনার মুখে কিন্তু কোনো জবাব সে দেয় না।

জেলে বুড়ী এক গেলাস দুধ নিয়ে আসে—বাবু, তুই খেয়ে নে, কাল রাতেও দুধ খাস্‌নি।

হুসনা জেলে বুড়ীর হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে বলে—তুমি যাও বুড়ী মা, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

জেলে বুড়ী বেরিয়ে যায়।

হুসনা দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে বলে—নিন, দুধটুকু খেয়ে নিন তো?

বনহুর কোনো কথা না বলে হাত বাড়ায় হুসনার দিকে।

হুসনা দুধের গেলাসটা ওর হাতে না দিয়ে মুখে ধরে—নিন খান দেখি।

বনহুর অগত্যা দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে।

হুসনা বলে—দু'দিন হল অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন, আজ বিশ্রাম করুন দেখি।

বনহুর বললো—মিস হুসনা, জংলীরাণীকে খুঁজে না পেলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। আমি চেয়েছিলাম জংলীরাণীর মাধ্যমেই জেলে এবং জংলীদের মধ্যে এই মিলন সেতুটা মজবুত হবে। কিন্তু হলো না...একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর।

হুসনা বলে উঠে—আপনি মিছামিছি বেশি ভাবছেন। নিশ্চয়ই জংলীরাণী এসে পড়বে।

একটা বেদনাভরা হাসি ফুটে উঠে বনহুরের মুখে, বলে বনহুর—মিস হুসনা, এ দ্বীপের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা তার সন্ধান চালাইনি কিন্তু তার কোনো খোঁজেই পেলাম না।

আপনি বিশ্রাম করুন মিঃ চৌধুরী।

বনহুর খাটিয়ায় চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

হুসনা বসলো তার পাশে। ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে চললো সে।

বনহুর দু'দিন দু'রাত ঘুমায়নি তাই সে অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে।

চোখ বন্ধ করতেই স্বপ্ন দেখে বনহুর।

...বনহুর জঙ্গলে জঙ্গলে জংলীরাণীকে খুঁজে ফিরছে। অনেক খোঁজাখুঁজি কারার পর একটা গাছের ছায়ায় এসে বসলো সে। শীতল বাতাসে দেহটা যেন জুড়িয়ে গেলো। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। গাছে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করলো ঠিক ঐ মুহূর্তে জংলীরাণী এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে। হাস্যোজ্জল দীপ্ত তার মুখ, হাতে তীর ধনুক। পরনে হরিণের চামড়া, গাছের

ছাল দিয়ে বক্ষ বেষ্টনী করা। দীর্ঘ চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পিঠে কাঁধে বুকে। বললো জংলীরাণী— বা— বু— এ— তো— আ— মি— এ— সে— ছি— হাত বাড়ালো জংলীরাণী বনহুরের দিকে—এ—সো—

বনহুর দূরে থেকেই হাত বাড়িয়ে বললো—তুমি এসেছো জংলী রাণী...জংলীরাণী...

হুসনা তখনও পাশে বসে ছিলো।

বনহুরকে হঠাৎ এভাবে বলতে শুনে সে বলে উঠলো—কোথায়? কোথায় জংলীরাণী? মিঃ চৌধুরী, আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন?

বনহুর জেগে উঠে ধড়মড় করে বসে বলে—মিস হুসনা, জংলীরাণী এসেছিলো না?

এ আপনি কি বলছেন মিঃ চৌধুরী? কোথায় জংলীরাণী? আপনি ঘুমাচ্ছিলেন।

ও। বনহুর শব্দটা উচ্চারণ করে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে।

হুসনা তখনও তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

❑

বাবু, এমন করে আর কত খুঁজবি? জংলীরাণী কোথায় হারিয়ে গেলো কে জানে। চল বাবু, বাড়ি ফিরে চল। জেলে বাবু বনহুরের পিছু চলতে কথাগুলো বললো।

বনহুর ক'দিন থেকে অবিরাম জংলীরাণীকে খুঁজে চলেছে এখন সে দলবল সহ খোঁজে না; একা একাই জঙ্গলের মধ্যে, হ্রদের ধারে, সমুদ্র তীরে খুঁজে বেড়ায়। কোনো কোনা দিন জেলে বাবা তার সঙ্গে যায়।

আজ জেলে বাবা বনহুরের সঙ্গে গিয়েছিলো, কারণ না গিয়ে সে পারেনি। আজ ক'দিন ধরে বনহুর তেমন করে খায় না, সব সময় চিন্তা করে, কেমন যেন উদাসীন ভাব ফুটে উঠেছে তার মধ্যে বনহুরকে লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে পড়েছে জেলে বাবা। আজকাল তাই সে মাছ ধরতে না গিয়ে প্রায়ই বনহুরের সঙ্গে থাকে।

সব সময় বাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করে নানাভাবে কিন্তু বনহুর কোনো জবাব দেয় না জেলে বাবার কথায়, কারণ সে জানে, জংলীরাণী তাকে ছাড়া একদিনও কোথাও থাকবে না বা থাকতে পারে না, অকস্মাৎ জংলীরাণী যেন উবে গেছে কর্পুরের মত বাতাসের মধ্যে।

হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে বলে বনহুর—জেলে বাবা, সে গেলো কোথায়?

বনহুর জানতো জেলে বাবা এই জবাবই দেবে তবু না বলে যেন পারেনি সে। একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ে বনহুর।

জেলে বাবাও বসে পড়ে তার পাশে।

জায়গাটা সমুদ্রতীর থেকে কিছু দূরে। একটা গাছ আছে—পুরোন অশ্বত্থ গাছ সেটা। এদিকে বড় কেউ আসে না। জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। অবশ্য এদিকটায় কেউ না আসার একটা কারণ আছে, সে হলো গাছটা অদূরে সমুদ্র তীরের দিকে কিছু অংশ নিয়ে চোরাবালি রয়েছে।

কোনো জেলে বা জংলী ভুল করে এদিকে কোনোদিন না এলেও গরু-বাছুর ভুল করে এসে পড়ে, তখন সে আর ফিরে যেতে পারে না। কোনোক্রমে চোরাবালির মধ্যে পা পড়লেই তলিয়ে যায় সে চোরাবালির অতলে।

বনহুর গাছটার নিচে বসে তকিয়ে ছিলো সম্মুখের দিকে। হঠাৎ চোরাবালির দিকে নজর গিয়ে পড়ে, চমকে উঠে সে। চোরাবালির নিকটে একটা কি যেন পড়ে আছে বলে মনে হলো তার।

বনহুর উঠে সেইদিকে পা বাড়াতেই জেলে বাবা চিৎকার করে উঠলো—বাবা, এ তুই কি করছিস। ওদিকে চোরাবালি...যাস্ নে বাবু, ওদিকে চোরাবালি, যাস্‌নে...

বনহুর ততক্ষণে একেবারে চোরাবালির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে উবু হয়ে তুলে নেয় একটা জিনিস। ততক্ষণে জেলে বাবাও তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বনহুর জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠে—জেলে বাবা এ যে জংলীরাণীর বক্ষবেষ্টনী। তাকায় বনহুর নিচের দিকে, চমকে উঠে সে দেখতে পায় বালির উপরে স্পষ্ট পায়ের ছাপ।

জেলে বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে—বাবু, বাবু জংলীরাণীকে চোরাবালি টেনে নিয়েছে। ঐ দেখ্ বাবু, জংলীরাণীর পায়ের ছাপ আর তোর হাতেও ওটা জংলীরাণীর বক্ষবেষ্টনী...

বনহুরের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছে জংলীরাণীকে তারা কেন খুঁজে পায়নি। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আর ব্যথা বনহুর হজম করার জন্য অধর দংশন করে মুখটা ফিরিয়ে নেয় বিপরীত দিকে।

ঠিক ঐ সময় পেছনে হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকায় বনহুর আর জেলে বাবা। হাসির শব্দটা ঠিক জংলীরাণীর হাসির মতই মনে হলো কিন্তু তাকিয়ে দেকতে পেলো তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে চুমকি খিল খিল করে হাসছে।

বনহুর আর জেলে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো চুমকী—জংলীরাণীকে তোরা আর খুঁজে পাবি না। আবার হাসে চুমকী, তারপর বলে—ঐ চেরাবালি তাকে টেনে নিয়েছে...ঐ চোরাবালি তাকে টেনে নিয়েছে...এবার দাঁত পিষে বলে—আমার রাজুকে সে খুন করেছিলো, তাই আমি তাকে খুন করেছি...আমি তাকে খুন করেছি। অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে চলে যায় চুমকী।

বনহুর আর জেলে বাবা হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে চুমকীর চলে যাওয়া পথের দিকে।

❑

সমুদ্রের ধারে যেখানে কয়েকটা পাথরখন্ড ছড়িয়ে পড়েছিলো সেখানে একটি পাথরের উপরে চুপচাপ বসেছিলো বনহুর। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলো আছড়ে পড়ছিলো তার পায়ের কাছে।

উতলা বাতাসে তার চুলগুলো এলোমেলোভাবে উড়ছে।

বনহুর ভাবছিলো জংলীরাণীর কথা। সেই হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখ, সরল সহজ টানা টানা দুটি চোখ, শিশুর মত কথা বলার ভঙ্গী—আজ সব কথা

তার মনকে যেন অস্থির করে তুলছিলো। বনহুর ভাবতে পারেনি নিজের অজান্তে কখন জংলীরাণী তার মনের অনেকখানি অংশ দখল করে নিয়েছিলো। জংলীরাণীকে সে কোনো সময় ভালোবাসেনি বা ভালবাসতে চায়নি। চেয়েছিলো ওকে মানুষ করে তুলতে। জংলীরাণীর সেই আধো ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর ফুটে উঠে তার কানের কাছে বাবু-বা-বু—তু—ই—এ—খা—নে—আ—মি—তো—কে—খুঁ জে—ফি—র—ছি

সমুদ্রের জলরাশির বুকে উচ্ছল ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে উঠে জংলীরাণীরে মখু। বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে উঠে সে আপন মনে—জংলীরাণী, তুমি এমনি করে হারিয়ে যাবে জানলে আমি তোমাকে এভাবে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করতাম না। সমুদ্রের তলে একদিন তুমি সমুদ্রের বুকে ভেসে এসেছিলে আবার তুমি তলিয়ে গেলে। কেউ কোনোদিন আর তোমাকে খুঁজে পাবে না।

বাবু, কার সঙ্গে কথা বলছিস্?

ফিরে তাকায় বনহুর, জেলে বাবা জাল কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে পাথরখন্ডটার উপর।

বনহুর তাকাতেই বলে জেলে বাবা—বাবু, জংলীরাণীর জন্য আমার কি কম দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু কি করবো বুকে আগুন চেপে কাজ করে যাচ্ছি চল্ বাবু, ঘরে চল্।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

ঐ মুহূর্তে মংলু ছুটে আসে—বাবু ঐ দেখো সমুদ্রে বোট-নৌকা দেখা যাচ্ছে, ঐ দেখো। আংগুল দিয়ে দূরে অনেক দূরে দেখায় মংলু।

বনহুর আর জেলে বাবা একসঙ্গে তাকায় সম্মুখে, দেখতে পায় দূরে একটি মোটরবোট এগিয়ে আসছে। মোটরবোটে দু'জন লোক আছে বলে মনে হচ্ছে।

জেলে বাবা বলে উঠে বাবু, বিদেশী লোক দেখতে পাচ্ছিস না?

হাঁ, দেখতে পাচ্ছি জেলে বাবা, নিশ্চয়ই এরা এদিকে আসছে।

বনহুর গা থেকে জামা খুলে নাড়তে শুরু করে দিলো।

মংলু মুখের সম্মুখে হাত রেখে চিৎকার করে ডাকতে থাকে—ও—হো—ও—ও—হো।

জেলে বাবাও শব্দ করে মংলুর মত করে।

বনহুর জামা খুলে নাড়তে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোটরবোটখানা এদিকে এগুচ্ছে বলে মনে হলো। ওরা তাদের দেখতে পেয়েছে, নাহলে অন্য দিকে চলে যেতো।

বনহুর জামাটা নাড়ছে। যদিও তার চোখেমুখে একটা বিষণ্নতার ছাপ বিদ্যমান, তবু একটা আনন্দ অনুভূতি জাগলো তার মনে। হয়তো এবার তাদের এ বন্দীত্বের অবসান ঘটবে।

এক সময় মোটরবোটখানা আরো অনেক এগিয়ে এলো। মোটরবোটখানার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তারা। আর কিছু সময়ের মধ্যেই এসে পড়বে আরও নিকটে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লো মোটরবোটখানা। বনহুর আর জেলে বাবা দেখলো মোটরবোটখানায় দু'জন সাহেব রয়েছে। তারা কে এবং কি কারণে এসেছে জানা দরকার মনে করে বনহুর। জেলে বাবা আর মংলু এসে দাঁড়ালো সমুদ্রের পানির ধারে।

ততক্ষণে বোটখানা থেকে নেমে এলো দু'জন সাহেব। তারা সম্পূর্ণ বিদেশী তাদের চেহারা এবং পোশাক পরিচ্ছদ ও কথা বলার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারে বনহুর।

জেলে বাবা প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু সে ওদের কোনো কথা বুঝতে না পেরে ফিরে আসে, বলে—বাবু, ওরা কি বলছে আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না।

বনহুর এবার এগিয়ে গেলো।

দু'জন সাহেব তখন এগিয়ে আসেছে তার দিকে। বনহুর লক্ষ্য করে ইংরেজীতে বললো ওদের একজন—আমরা বিভিন্ন দ্বীপে অবতরণ করে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছি। নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করাও আমাদের কাজ।

বনহুর তাদের কার্যপদ্ধতির বিষয় জানতে পেরে খুশি হলো বললো—আপনারা এমন একটা দ্বীপে এসে পৌছেছেন যেখানে কোনোদিন কোনো

জাহাজ আসতে পারে না। এ দ্বীপটা সম্পূর্ণ একটা নতুন দ্বীপ। আপনারা এখানে এসে নতুন এক দ্বীপ আবিষ্কারে সক্ষম হলেন।

বনহুর আর সাহেবদ্বয়ের মধ্যে ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলছিলো। জেলে বাবা এবং মংলু একটুও বুঝতে পারছিলো না। বনহুর সাহেবদের আগমনের কারণ জেলে বাবাকে বুঝিয়ে বললো।

জেলে বাবা খুশি হলো, বললো—বাবু, ওদের নিয়ে চল্। আমাদের কুটিরে থেকে ওরা সব ঘুরেফিরে দেখবে।

বনহুর জেলে বাবার কথা সাহেবদ্বয়কে বুঝিয়ে বললো। জেলে বাবার কথা শুনে আনন্দিত হলো সাহেবদ্বয়। তারা হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো জেলে বাবার।

জেলে বাবার সঙ্গে সাহেবদ্বয় সহ বনহুর ফিরে এলো কুটিরে।

হুসনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। বনহুর লক্ষ্য করলো, হুসনা এদের দেখে মোটেই খুশি হয়নি।

বললো বনহুর—মিস হুসনা, এবার আপনি আপনার বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে সক্ষম হবেন, কারণ এদের জাহাজ মাঝসমুদ্রে অপেক্ষা করছে।

হুসনা কোনো জবাব দিলো না।

জেলে বাবা বনহুর আর হুসনাকে যেমন আদর-যত্ন করেছিলো তেমনি করলো বিদেশীদের। দু'দিন দু'রাত এরা কুন্দল দ্বীপে থাকবে বলে জানালো।

বনহুর এদের সহায়তা করবে বলে কথা দিলো।

সাহেবদ্বয়কে বনহুর এবং জেলে বাবা নিয়ে সমস্ত দ্বীপটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালো, এমন কি জংলীদের সঙ্গেও তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

জংলী আর জেলেদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব জমে উঠেছে এবং এই সুন্দর মিলনের মহান নায়ক মিঃ চৌধুরী, শুনে খুশি হলো সাহেবদ্বয়।

নতুন অনেক কিছু জেনে নিলো বিদেশী সাহেবদ্বয়, তারপর একদিন তারা বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলো।

ইতিমধ্যে বনহুর তাদের কাছে বলেছিলো কি করে বনহুর আর হুসনা এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছে এবং এ দ্বীপে আসার পর থেকে সব সময়ের জন্য

প্রতীক্ষা করছে কোনো সভ্য মানুষের আগমন হয় কিনা কিংবা কোনো জাহাজ বা নৌকা আসে কিনা। বনহুরের মুখে তাদের এ দ্বীপে আসা সম্বন্ধে সবকিছু শোনার পর বিদেশী সাহেবদ্বয় তাদের দু'জনকে সঙ্গে নেবার জন্য আগ্রহী হলো।

একদিন বিদায়ের পালা।

জেলে বাবা ও তার দলবল সবাই ঘিরে দাঁড়ালো বনহুর আর হুসনাকে। জংলীসর্দার ও তার সঙ্গী-সাথীরাও এসেছে বিদায় জানাতে তাদের বাবুকে। সবার চোখে পানি ছলছল করছে মুখোভাব বিষণ্ন মলিন।

এদের ছেড়ে যেতে বনহুরেরও কম কষ্ট হচ্ছিলো না। দীর্ঘ দুটো বছর তাদের কেটেছে এই কুন্দল দ্বীপে। জেলে বাবা ও অন্যান্য জেলের মহৎ ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলো বনহুর আর হুসনা। আজ তাই এদের ছেড়ে যেতে মন ব্যথায় কেঁদে উঠছিলো হু হু করে।

আজ বারবার বনহুরের মনে পড়ছিলো জংলীরাণীর কথা। সেই উচ্ছল-চঞ্চল-দুরন্ত তরুণী যার নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ হয়ে সে মৃত্যু পথের যাত্রী হয়েছিলো। সেদিন জেলেবাবা যদি তাকে বাঁচিয়ে না নিতো তাহলে আজ পৃথিবীর বুকে তার কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। বিদায় মুহূর্তে আজ তারই স্মৃতি বনহুরকে বেদনাকাতর করে তুলেছিলো। দূরে বহুদূরে সেই চোরাবালির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর, ঐ ওখানে বালির তলায় সমাধি রচনা হয়েছে জংলীরাণীর। ক'দিন আগেও সে এই পৃথিবীর বুকে হেসে-খেলে বেড়াতো, আর আজ সে নেই—

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সাহেবদ্বয়ের প্রথম জন মিঃ হেনরী বার্ট বলে উঠেন— আসুন মিঃ চৌধুরী, আমরা সকাল সকাল রওয়ানা দেবো।

বনহুর ফিরে তাকালো, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। জেলে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো—জেলে বাবা,। চললাম জংলী সর্দারের সঙ্গে সব সময় মিল রেখে চলবে। তোমাদের উপকারের কথা কোনোদিনই ভুলবো না। আসি জেলে মা।

জেলেবুড়ি আঁচলে চোখ মুছে বললো—আশীর্বাদ করি তোমরা ভালোভাবে দেশে ফিরে যাবে।

বনহুর আর হুসনা মিঃ হেনরী আর মিঃ জোসেফের সঙ্গে মোটরবোটে চেপে দাঁড়ালো।

প্রথম ব্যক্তি মিঃ হেনরী বার্ড আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মিঃ জেমস! তারাও হাত নাড়াতে লাগলেন।

বনহুর আর হুসনা অনুভব করলো তারা যেন তাদের পরম আত্মীয় জনদের ছেড়ে চির বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। বনহুর হাত নাড়ছে, তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

জেলে বাবা ও জংলী সর্দার হাত নাড়তে লাগলো।

মোটরবোট শব্দ করে দ্রুত এগিয়ে চললো মাঝ সমুদ্রের দিকে।

ক্রমে ঝাপসা হয়ে এলো কুন্দল দ্বীপ ও দ্বীপের বাসিন্দারা। বনহুর আর হুসনার মনে জাগতে লাগলো কত কথা, কত স্মৃতি। এতগুলো দিন তাদের কিভাবে কেটেছে জেলেদের মধ্যে। কত হাসি, কত গান, কত কথা ছড়িয়ে আছে কুন্দল দ্বীপের আকাশে বাতাসে।

❑

মিঃ হেনরী বার্ড এবং মিঃ জোসেফের মহৎ ব্যবহারে খুশি হলো হুসনা আর বনহুর। তারা যথেষ্ট সম্মান ও আদর-যত্ন দেখিয়ে নিয়ে চললো তাদের। যদিও মিঃ হেনরী বার্ট নতুন দ্বীপ আবিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিলো তবু তারা বনহুর আর হুসনাকে কোনো যাত্রবাহী জাহাজে পৌঁছে দেবার জন্য যে কোনো বন্দর অভিমুখে রওয়ানা দিলো।

জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

আজ তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজখানা! সীমাহীন জলরাশির বুক চিরে ঝক্ ঝক শব্দ করে এগুচ্ছে মিঃ হেনরী বার্ডের জাহাজখানা, ঠিক যেন একটা জীবন্ত জন্তুর মতো।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

পাশে হুসনা।

মিঃ হেনরী বার্ড এসে দাঁড়ালো পাশে। সিগারেট-কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর মিঃ হেনরীর সিগারেট— কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললো—ধন্যবাদ!

মিঃ হেনরী হেসে বললো—আপনার আচরণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট মিঃ চৌধুরী, এখন ভালোয় ভালোয় আপনাদের কোনো যাত্রীবাহী জাহাজে পৌঁছে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

মিঃ হেনরী এবং বনহুর ও হুসনা মিলে নানারকম আলাপ আলোচনা চলতে থাকে।

কথায় কথায় মিঃ হেনরী—আজ প্রায় এগারো মাস হলো আমরা সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়েছি—কয়েকটা নতুন দ্বীপ আবিষ্কারেও সক্ষম হয়েছি। একটা অদ্ভুত দ্বীপে আমরা গিয়েছিলাম সেখানে অসংখ্য পিঁপে মানুষ।

বনহুর এবং হুসনা বলে উঠে—পিঁপে মানুষ।

হাঁ, পিঁপে মানুষ।

বনহুর বললো—সে কেমন ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ হেনরী?

হুসনার চোখেও বিস্ময়!

মিঃ হেনরী বললো—আমি তাদের আলোকচিত্র এনেছি, যদি দেখতে চান দেখাতে পারি।

বনহুর এবং হুসনা দেখবে বলে জানালো।

মিঃ হেনরী বললো—শুধু আলোকচিত্র নয়, বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নতুন নতুন জিনিস আমরা সংগ্রহ করে এনেছি তাও দেখাবো। মিঃ চৌধুরী এবং মিস হুসনা, আসুন আমার সঙ্গে।

বনহুর এবং হুসনা অনুসরণ করলো মিঃ হেনরীকে।

মিঃ হেনরী এসে দাঁড়ালো একটি ক্যাবিনের সম্মুখে। ক্যাবিনের দরজা বন্ধ ছিলো, মিঃ হেনরী দরজার পাশে একটা সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো।

ক্যাবিনে প্রবেশ করলো মিঃ হেনরী, পেছনে বনহুর আর হুসনা।

ক্যাবিনটা যেন একটা যাদুঘর।

অদ্ভুত লালচে আলো জ্বলছে।

ক্যাবিনের চারপাশে দেয়ালে তক্তা দিয়ে সুন্দর তাক তৈরি করা হয়েছে! তাতে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের অদ্ভুত জিনিসপত্র।

মিঃ হেনরী এক একটা জিনিস দেখিয়ে তার বর্ণনা দিতে লাগলো।

একটা জমকালো পাথর হাতে নিয়ে বললো মিঃ হেনরী—এ পাথরটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের বলুন তো?

বনহুর কিছুক্ষণ পাথরটা লক্ষ্য করে বললো—এটা একটা কালো পাথর বলে মনে হচ্ছে মিঃ হেনরী।

না, এটা কালো পাথর নয়। এটা একটা জীব। কথা কয়টা বলে মিঃ হেনরী কালো পাথরটাকে সম্মুখের টেবিলে রাখলো।

হুসনা বললো—আশ্চর্য, এটা জীব হতেই পারে না।

মিঃ হেনরী বললো—মিস হুসনা, এক সময় আমারও এমনি ধারণা ছিলো কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। এটা পাথর আকারের জীবন। জীবন্ত পাথর বলতে পারেন। মিঃ হেনরী টেবিলে কলিং বেলে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা খালাসী ধরনের লোক এসে দাঁড়ালো।

মিঃ হেনরী তাকে লক্ষ্য করে বললো—এক বাটি ওভালটিন নিয়ে এসো।

বেরিয়ে গেলো খালাসিটা!

একটু পরে এক বাটি ওভালটিন সহ ফিরে এলো খালাসি।

মিঃ হেনরী ওর হাত থেকে বাটিটা নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর টেবিল থেকে তুলে নিলো চ্যাপ্টা গোলাকার কালো পাথরটা। এবার মিঃ হেনরী পাথরটাকে ওভালটিনের বাটির মধ্যে ডুবিয়ে দিলো।

আশ্চর্য হয়ে দেখলো বনহুর আর হুসনা পাথরটা বাটির মধ্যে চলাফেরা করছে এবং একটা চুক চুক শব্দ করে ওভালটিন খাচ্ছে।

কয়েক মিনিটেই প্রায় অর্ধেকটা ওভালটিন শেষ হয়ে গেলো।

মিঃ হেনরী বললো—দেখলেন তো এটা শুধু প্রাণহীন পাথর নয়, এটা একটা জীব—যে দিব্য চলাফেরা করতে পারে এবং খেতেও পারে।

বনহুর বললো—তাইতো দেখছি।

হুসনা বললো—এ পাথর আপনারা কোথায় পেলেন?

নতুন এক দ্বীপে। যে দ্বীপে পিঁপে মানুষ আছে, সেই দ্বীপেই পাওয়া গেছে এ পাথর।

বনহুর বললো—নিশ্চয়ই সেখানে এ ধরনের বহু পাথর আছে?

হ্যাঁ, বহু আছে।

এর চেয়ে ছোট এবং বড় আছে নিশ্চয়ই?

ছোট এর চেয়ে নেই তবে বড় আছে। শুধু বড় নয়—একেবারে বৃহৎ আকার। মিঃ চৌধুরী আমরা যখন সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছি তখন প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ দ্বীপে একটা মানুষও আমরা দেখতে পেলাম না। আচ্ছা বসুন, আমি প্রথমে পিঁপে মানুষের ছবিগুলো আপনাদের দেখিয়ে নেই। বসুন।

বনহুর আর হুসনা বসলো।

মিঃ হেনরী বের করলো কতকগুলো ছবি। এক একটা ছবি বের করে বনহুর আর হুসনার সম্মুখে মেলে ধরলো।

বনহুর আর হুসনার ছবি দেখে বিস্মিত হলো। একটা ছবিতে ঠিক পাশাপাশি দুটো পিঁপে বা তেলের ড্রাম যেন কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক পিঁপে বা ড্রামের উপরে একটি করে মাথা নিচের দুটো পা বলে মনে হচ্ছে। দুপাশে দুটো খুদে দাঁত দোল খাচ্ছে যেন।

মিঃ হেনরী বললো—ঐ দ্বীপের নাম হলো হুলু দ্বীপ। এরা দু'জন হুলু দ্বীপের রাজা-রাণী।

বনহুর শুধু বিস্মিত নয় যেন হতবাক হয়ে গেছে। আশ্চর্য এর হুলুদ্বীপের রাজ-রাণী। অপর একখানা ছবিতে প্রায় পাশাপশি একশ' জন পিঁপে লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার দেহে এক ধরনের পোশাক।

বনহুর বললো—এরা কি রাজা-রাণীর সৈন্য-সামন্ত?

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আপনি ঠিক ধরেছেন। এরা মহারাজা এবং মহারাণীর সৈন্য-সামন্ত।

মিঃ হেনীর হুলু দ্বীপের জনগণের ছবি দেখালেন। কেউ বা মাঠে কাজ করছে, কেউ বা গরু চরাচ্ছে, কেউ বাজারে যাচ্ছে। অদ্ভুত মানুষগুলো।

এ দেশের গরু-ছাগলগুলোও যেন অদ্ভুত। সব গোলগাল এক একটা ফুটবলের মতো। বনহুর আর হুসনা অবাক হয়ে ছবিগুলো দেখছে, তখন মিঃ হেনরী বার্ড বললেন—এই দেশের নদীনালায় জন্ম এ পাথর জীবের। এরা নদীনালার মধ্যে পড়ে থাকে—পানি পান করে, সুযোগ পেলে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

বনহুর এবার পাথরটা নিজের হাতে তুলে নিলো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো—আশ্চর্য পাথর বটে, প্রাণহীন পাথর হলেও খায়,ঘুরে বেড়ায়।

মিঃ হেনরী বার্ড আরও অনেক জিনিস দেখালেন যা বনহুর আর হুসনার জীবনে খুব কমই দেখেছে।

ক'দিন কেটে গেলো।

পঞ্চম দিনে মিঃ হেনরীর জাহাজ এসে ভিড়লো গিরিগুরু বন্দরে।

মিঃ হেনরী বার্ড ও তার দলবলের কাছে বিদায় নিয়ে বনহুর আর হুসনা গিরিগুরু বন্দরে নেমে পড়লো। এই বন্দর থেকে তারা কান্দাইয়ের উদ্দেশ্যে কোনো যাত্রীবাহী জাহাজে রওয়ানা দেবে।

❑

প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ ফারুক আহসান তাঁর কন্যা হুসনাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললেন—মিঃ চৌধুরী, আপনি আমার মেয়ে হুসনার শুধু রক্ষকই নন, আপনি তার জীবনদাতা...

একটু হেসে বললো বনহুর—সবই খোদার ইচ্ছা মিঃ আহসান, আমার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুই করেছি।

হুসনার কাছে সব শুনেছি মিঃ চৌধুরী, সুদীর্ঘ দু'টি বছর ধরে আপনি যা করেছেন তার কোনো প্রতিদান হয় না। আজ আপনার কাছে একটা কথা বলবো মিঃ চৌধুরী?

বনহুর পূর্বের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো—বেশ বলুন?

আহসান সাহেব বসেছিলো, এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন আপন মনে, তারপর বসে পড়ে বললেন—হুসনা আমার বড় আদরের মেয়ে...থেমে পড়লেন, তারপর পুনরায় বললেন—হুসনাকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করতে চাই মিঃ চৌধুরী। যদি আপনি তাকে গ্রহণ করেন তাহলে বড় খুশি হবো।

কথাটা বলে আহসান সাহেব উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন বনহুরের মুখের দিকে। তিনি জানেন, তাঁর এ প্রস্তাব মিঃ চৌধুরী উপেক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু বনহুর যখন বললো—আপনার প্রস্তাবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি মিঃ আহসান কিন্তু আমি বিবাহিত, তাই আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

বনহুর আর আহসান সাহেব যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন হুসনা আড়াল থেকে সব শুনছিলো। পিতা যখন মিঃ চৌধুরীর কাছে তাকে

সমর্পণের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তখন তার অন্তর জুড়ে এক অনাবিল আনন্দ উৎস বয়ে চলেছিলো। যা সে এতদিন বলতে পারেনি আজ তাই তার আব্বু বলছেন, নিশ্চয়ই মিঃ চৌধুরী তার পিতার এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করবেন। কিন্তু যখন সে মিঃ চৌধুরীর মুখে শুনলো—আমি বিবাহিত, তাই আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না...কথাটা হুসনার হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো। এতদিন ধরে মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে সে যে কল্পনার সৌধ গড়েছিলো, নিমিশে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। খান খান হয়ে গেদো তার অন্তরটা। ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মিঃ আহসান বললেন—আপনি বিবাহিত, নিশ্চয়ই হুসনা একথা জানে না।

বললো বনহুর—হয়তো হবে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন আহসান সাহেব তারপর বলেন তিনি—বলুন আপনি কি চান? যা চাইবেন তাই দেবো মিঃ চৌধুরী।

আপনার কথা শুনে আমি খুশি হলাম মিঃ আহসান। যদি কোনোদিন কিছু প্রয়োজন বোধ করি আসবো।

নিশ্চয়ই আসবেন। মিঃ চৌধুরী, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন, আমি যে কাজের দায়িত্বভার নিয়ে কান্দাই এসেছি সে কাজে আমি জয়ী হবো বলে আশা করি এবং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দু'লাখ টাকা আমি পাবো।

হেসে উঠলো বনহুর—দু'লাখ পেলে আমাকে সেই টাকার কিছু দেবেন কথা দিচ্ছেন?

বিশ্বাস করুন মিঃ চৌধুরী, আমি...

থাক তখন হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হয়েছেন জানতে পারি কি?

হাঁ পারেন। মিঃ চৌধুরী, আমি কান্দাই আসার পর থেকে দস্যু বনহুর উধাও হয়েছে।

কারণ আপনার মত প্রখ্যাত গোয়েন্দার আগমনে দস্যু বনহুর পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে...

সত্যি মিঃ চৌধুরী, কিছুদিন হলো সমস্ত কান্দাই শহর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যু বনহুর ভুলেও কান্দাইয়ের মাটিতে পা রাখেনি।

তাহলে তাকে কি করে গ্রেপ্তার করবেন মিঃ আহসান, দস্যু বনহুর যদি ভয় পেয়েই পালিয়ে গিয়ে থাকে তবে বৃথা আপনার প্রচেষ্টা।

কিন্তু কতদিন সে পালিয়ে বেড়াবে। একদিন না একদিন সে আসবেই। দস্যু বনহুররের মা-স্ত্রী-পুত্র আছে এই কান্দাই শহরে। কাজেই না এসে পারে না। আমাদের পুলিশবাহিনী সর্বদা তার বাড়ির উপর কড়া নজর রাখছে।

তাহলে তো কোনো কথাই নেই মিঃ আহসান, দস্যু বনহুর যেখানে থাকুক না কেন, নিশ্চয় সে স্ত্রী-পুত্র-মাকে দেখতে আসবেই, তখন আপনারা তাকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হবেন।

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আমি সেই রকম আশা রাখি। এ ছাড়া আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি।

নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন? যাক, এ সব কথা বাইরের লোকের কাছে ব্যক্ত করা মোটেই উচিত নয়।

আপনি আমার যে উপকার করেছেন তাতে কোনো সময় আপনাকে অপর লোক ভাবতে পারি না মিঃ চৌধুরী। কাজেই আপনার কাছে সব কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। গলার স্বর নীচু করে বলেন মিঃ আহসান—আমরা দস্যু বনহুরের মাকে তাঁর বাড়ি থেকে গোপনে সরিয়ে রাখতে চাই। তাঁকে সরাতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। মায়ের নিরুদ্দেশ সংবাদ নিশ্চয়ই বনহুরের কানে পৌছবে, তখন সে যেখানেই থাক না কেন, ছুটো আসবে এবং হন্যে হয়ে মায়ের সন্ধান করবে, তখন তাকে গ্রেফতার করতে কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

বনহুর বলে উঠলো—চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছেন মিঃ আহসান, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়বেন না দেখছি। দস্যু বনহুরকে যে

আঘাতটা চরম লাগবে আপনারা সেই আঘাতটাই তাকে দিতে যাচ্ছেন। আপনাদের কামনা সার্থক হোক মিঃ আহসান। চলি দেখা হবে আবার।

কথা দিচ্ছেন তো?

হাঁ, কথা দিলাম।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুসনা এসে দাঁড়ালো—মিঃ চৌধুরী, না খেয়ে আপনি চলে যাবেন তা কি হয়।

বনহুর তাকালো হুসনার দিকে, দেখলো তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কেঁদেছে হুসনা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ আহসান বললেন—হাঁ, হুসনা ঠিকই বলেছে, না খেয়ে আপনি চলে যাবেন তা কি হয়।

বনহুর বললো—চা-নাস্তা খেয়েছি। আর খাওয়া সম্ভব নয়।

না, আপনাকে যেতে দেবো না। হুসনা পথ আগলে দাঁড়ালো।

হাসলো বনহুর।

আহসান সাহেব বললেন—হুসনা যখন বলছে তখন খাওয়া দাওয়া করে যাবেন।

পর্দা নড়ে উঠলো, ভিতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ —হুসনা অনেক কেঁদেছে, আর ওকে কাঁদাবেন না, এটাই আমার অনুরোধ। আপনি কিছু বিলম্ব করে খেয়ে যাবেন।

আহসান সাহেব বললেন—শুনলেন মিঃ চৌধুরী, হুসনার মায়ের কথা। আপনাকে বিলম্ব করেই যেতে হবে।

এবার বনহুর হুসনার দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, তাই হোক।

হুসনা নিজের হাতে রান্না করে মিঃ চৌধুরীকে খাওয়ালো, তারপর বিদায়ের পালা।

বনহুরকে বিদায় দিতে গিয়ে হুসনার মন হু হু করে কেঁদে উঠলো কিন্তু কি করে ধরে রাখবে সে মিঃ চৌধুরীকে। মিঃ চৌধুরী যে বিবাহিতা, তাকে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই।

বনহুর বিদায় মুহূর্তে একটি চিঠি মিঃ আহসান সাহেবের হাতে দিয়ে বলে—এটা রাখুন মিঃ আহসান সাহেব, অবসর মুহূর্তে পড়ে দেখবেন। হ্যান্ডসেক করলো বনহুর।

হুসনা ছলছল চোখে দাঁড়িয়েছিলো, বনহুর তাকে লক্ষ্য করে বললো—চলি মিস হুসনা, আবার দেখা হবে।

গাড়িতে উঠে বসলো বনহুর।

গাড়িখানা আহসান সাহেবের নিজের গাড়ি। ড্রাইভার বললো—কোথায় যাবো স্যার?

বললো বনহুর—মার্কোলাইট হাউস।

হাত নাড়তে লাগলো বনহুর।

আহসান সাহেব আর হুসনা হাত নেড়ে তাকে বিদায় অভিনন্দন জানালো।

গাড়িখানা দৃষ্টি আড়ালে চলে যেতেই মিঃ আহসান তাঁর হস্তস্থিত খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একখানা লাল চিঠি।

আহসান সাহেব এবং হুসনার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। চিঠিখানায় দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে চললেন আহসান সাহেব, চিঠিতে লেখা রয়েছে—

মিঃ আহসান—
আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের যে নতুন
পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তা থেকে বিরত
থাকবেন, নাহলে সমুচিত পুরস্কার পাবেন।
দস্যু বনহুর সব ক্ষমা করতে পারবে কিন্তু
তার মায়ের কোনো অপমান সে সহ্য করবে
না।

—দস্যু বনহুর

দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুর—হুসনা, মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুর। কথাগুলো চিৎকার করে বললেন মিঃ আহসান।

হুসনার দু'চোখ কপালে উঠেছে, সে নির্বাক হতভম্ব হয়ে পড়েছে। মিঃ চৌধুরী যে স্বয়ং দস্যু বনহুর, এ কথা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না। বলে উঠে—হুসনা—আব্বু, আপনি ভুল করছেন মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুর নয়।

মিঃ আহ্সান গম্ভীর হয়ে পড়েছেন।

বাড়ির চাকর-বাকর সবাই এসে উপস্থিত। দুজন পুলিশ গার্ড ছিলো তারাও দস্যু বনহুরের নাম শুনে ছুটে এসে পড়েছে।

হুসনার আম্মা কোনোদিন হলঘরে আসেন না, তিনিও হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখেমুখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে।

মিঃ আহ্সান বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর এসেছিলো আমার বাসায়, এত সাহস তার। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

হুসনা কাতর কণ্ঠে বললো—আব্বা, আমি তাঁকে ভালোভাবে জানি, তিনি দস্যু বনহুর নন।

মিঃ আহ্সান তখন কন্যার কথায় কান না দিয়ে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। তিনি প্রত্যেকটা থানা এবং পুলিশ অফিসে জানিয়ে দিলেন সমস্ত রাস্তায় পাহারাদার এবং ট্রাফিকগণকে যেন এই মুহূর্তে জানানো হয়। যে গাড়িতে বনহুর গেছে ঐ গাড়িখানা আহ্সান সাহেবের গাড়ি। গাড়ির নাম্বার জানিয়ে দিলেন আহ্সান সাহেব সব জায়গায়।

মুহূর্তে সমস্ত শহরে এক মহা হুলস্থুল পড়ে গেলো। দস্যু বনহুর...দস্যু বনহুর...

কিন্তু দস্যু বনহুর তখন মাঝপথে নেমে অপর একটা ভাড়ার গাড়িতে চলে গেছে তার শহরের আস্তানায়।

আহ্সান সাহেবের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার ফিরে চলেছিলো, হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশ গাড়িখানাকে আটক করে ফেলে এবং ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অফিসে পাঠিয়ে দেয়।

আহ্সান সাহেব সংবাদ পেয়ে ছুটলেন পুলিশ অফিসে। হুসনা নিজেও পিতার সঙ্গে গেলো কিন্তু গিয়ে যা দেখবে সে আশা করছিলো তা সে দেখতে পেলো না। ভেবেছিলো মিঃ চৌধুরীকে হাতকড়া পরা অবস্থায় দেখবে—আরও দেখবে এলেমেলো চুল, উদভ্রান্ত চেহারা, চোখেমুখে অসহায় ভাব। হুসনা পিতার হাতে-পায়ে ধরে তাকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করবে। পিতা যদি তাকে মুক্তি না দেয় তাহলে পুলিশ কমিশনারকে ধরবে। সত্যিই কি সে মিঃ চৌধুরীকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। যদি না হয়? মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুর এ কথা সত্য নয়, এটাই প্রমাণ করতে হবে। তার

জীবনই শুধু তিনি রক্ষা করেননি, দীর্ঘ দুটি বছর ধরে তাকে কত সাবধানে আগলে রেখেছিলেন। এতটুকু ক্ষতি যেন তার না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিলো মিঃ চৌধুরীর। আজ সেই মহান রক্ষক বিপদগ্রস্ত হবে তা সে সহ্য করবে—না না, সে পারবে না। মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুর হতে পারে না।

কিন্তু পুলিশ অফিসে পৌঁছে তার সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়—কোথায় মিঃ চৌধুরী? শুধু গাড়ি আর ড্রাইভারকে আটক করে রাখা হয়েছে।

হতাশ হলেন মিঃ আহসান।

এদিকে মিঃ জাফরী নিজেও এসে পড়েছেন সংবাদ পেয়ে।

আরও কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ গোয়েন্দা এসে হাজির হলেন।

আহসান সাহেবকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী—মিঃ আহসান, ব্যাপার কি সব সত্য?

হাঁ, তার প্রমাণ লাল চিঠি?

লাল চিঠি?

চলুন অফিসে গিয়ে বসি, তারপর সব শুনবেন।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ আহসান দলবল সহ পুলিশ অফিসের মধ্যে গিয়ে বসলেন। হুসনাও তাঁদের সঙ্গে।

মিঃ আহসান বললেন—মিঃ জাফরী, আপনি সব শুনলে আশ্চর্য হবেন।

একটু হেসে বললেন মিঃ জাফরী—মিঃ আহসান, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনি নতুন, তাই এ কথা বলছেন। আমরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, জানতাম দস্যু বনহুর যদি আত্মপ্রকাশ করেই থাকে, তবু তাকে গ্রেপ্তার করা এতটা সহজ নয়। হাঁ দেখি লাল চিঠিখানা?

মিঃ আহসান পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে হাতে দিলেন মিঃ জাফরীর। মিঃ জাফরী এনভেলাপ থেকে চিঠিখানা বের করে মেলে ধরলেন চোখের সামনে নয়—টেবিলে সকলের সামনে, যেন চিঠিখানা সবাই দেখতে এবং পড়তে পারে।

টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসেছিলেন কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার এবং ডি আই বি পুলিশ অফিসার।

মিঃ জাফরী চিঠিখানা নিয়ে বললেন—মিঃ আহসান, এ চিঠি দস্যু বনহুর আপনাকে কখন দিয়েছিলো?

সে যখন বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলো ঐ মুহূর্তে।

আপনি চিঠিখানা তখনই খুলে দেখনেনি কেন?

মিঃ চৌধুরীকে আমি কোনোরকম সন্দেহ করতে পারিনি, কারণ যে আমার কন্যাকে জলদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলো এবং দীর্ঘ দু'টি বছর ধরে কোনো এক অজানা দ্বীপে জেলেদের পরিবারের মধ্যে থেকে তার অভিভাবক হিসেবে তাকে রক্ষা করে এসেছে। শুধু তাই নয়, তাকে নানা কৌশলে কান্দাই এনে নিজে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। যে ব্যক্তি এত মহৎ তার প্রতি হঠাৎ রকম সন্দেহ আসাটা অস্বাভাবিক নয় কি?

মিঃ জাফরী হেসে বললেন—ঠিক বলেছেন মিঃ আহসান, দস্যু বনহুরের সে মহত্বটুকু আছে। হাঁ, আপনি কোনো ভুলে করেননি, কারণ হঠাৎ একজনকে সন্দেহ করা যায় না। চিঠিখানা আপনি কখন পড়লেন?

যখন দস্যু বনহুরের গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো তখন আমি চিঠিখানা পড়ে—

মিঃ আহসানের কথা শেষ হয়না হেসে উঠেন মিঃ জাফরী—আপনি দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে জানেননা এবং তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন, তাই এমন ভুল করেছেন। মিঃ আহসান, এখন থেকে আপনি সজাগ থাকবেন যেন এমন ভুল আর না হয়। এবার মিঃ জাফরী তাকালেন হুসনার দিকে—মা, তুমি বনহুরের যে রূপ দেখেছো তা তার আসল রূপ নয়। সে যেমন ভদ্র-মহৎ তেমনি নরপশু।

হুসনা বলে উঠে—আপনি ভুল করছেন মিঃ জাফরী, কারণ মিঃ চৌধুরীকে আমি যতখানি জেনেছি ততখানি আপনারা কেউ তাকে জানেন না।

হুসনা, তাকে দু'বছর হলো তুমি জানো, আর আমি তাকে দশ বছর হলো জানি। কথাটা বলে একটু হাসলেন মিঃ জাফরী, তারপর আবার বললেন—দস্যু বনহুরের ব্যবহারে কেউ কোনোদিন ত্রুটি খুঁজে পায়নি। প্রকাশ্য আচরণ তার খুবই প্রীতিজনক, কাজেই তাকে হঠাৎ কেউ দস্যু বলে মনেই করতে পারবে না।

মিঃ জাফরীর কথায় কোনো অফিসার কোনোরকম প্রতিবাদ করতে পারলেন না। হুসনাও যেন কোনো জবাব খুঁজে পেলো না।

কিছুক্ষণ জায়গাটা নীরব রইলো।

মিঃ জাফরীই পুনরায় বললেন—মিঃ আহসান, আপনি ভুল করেননি, কারণ দস্যু বনহুর শুধু আপনাকেই নয়, আমাকেও সে বহুবার নাকানি চুবানি খাইয়েছে।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—দস্যু বনহুর অদ্ভুত এক ব্যক্তি। তার কাজে নিখুঁত অভিনয় ভঙ্গি আছে যার দরুন সে অতি সহজেই সভ্য সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে পারে।

মিঃ হারুন বলে উঠেন—হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। শয়তানটা এ দিকে পাকা। আমাকে সে কতবার নাজেহাল করে ছেড়েছে।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ আহসান, আপনি যে প্ল্যান করেছিলেন তা ফাঁস হয়ে গেছে। দস্যু বনহুরের মাকে সরিয়ে তাকে আয়ত্তে আনবেন কিন্তু তা হলো না।

হাঁ, তাই হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন মিঃ আহসান।

হুসনা বলে উঠলো—দস্যু বনহুর তো কোনো অন্যায় করেনি, কেন তাকে গ্রেপ্তারের জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছেন আপনারা?

দস্যু বনহুর কোনো অন্যায় করেনি কে বললো? তাকে তোমরা কতটুকু জানো? তার সম্বন্ধে পুলিশ ডায়রী তুমি যদি দেখতে মা, তবে এ কথা বলতে পারতে না। শুধু কান্দাই শহর নয়, একরকম প্রায় সমস্ত পৃথিবীটা সে চষে ফিরেছে। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে সে অত্যাচার চালায়নি। তার অত্যাচারে দেশবাসী নিষ্পেষিত। কথাগুলো বলতে বলতে মিঃ জাফরীর মুখমন্ডল রাগে লাল হয়ে উঠলো।

মিঃ হুসাইন প্রখ্যাত পুলিশ সুপার, তিনি বললেন—ধনবানদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে সে বিলিয়ে দেয় আর বলে সে মহৎ কাজ করছে।

হেসে উঠলেন মিঃ জাফরী, তারপর বললেন—একজনের পরিশ্রম করা অর্থ বা ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে আত্মসাৎ করাকে মহৎ কাজ বলা যায় না। দস্যু বনহুর শুধু পরের সম্পদই লুটে নেয় না, সে নারী নির্যাতনও করেছে বহু।

হুসনা তীব্রকণ্ঠে বলে উঠে—মিথ্যা কথা। মিথ্যে কথা মিঃ জাফরী। মিঃ চৌধুরী যদি সত্যি বনহুর হয় তাহলে তাকে এক মহান মহৎ ব্যক্তি বলবো,. কারণ তার মতো পুরুষ পৃথিবীতে কমই হয়। নারী নির্যাতন সে করতে পারে না। আমি দীর্ঘ দু'বছর তার সঙ্গে একত্রে বাস করেছি কিন্তু তার মধ্যে কোনোদিন এতটুকু কুৎসিত মনোভাবের উদয় হতে দেখিনি। বিশ্বাস করুন সে একজন মহান ব্যক্তি।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—মিস হুসনা মিথ্যা বলেননি। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যারা ভালভাবে জানে তারাই বলেছেন সে নরহত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু নারী নির্যাতন সে করে না। নারীদের সে সব সময় সম্মান দিয়ে থাকে।

মিঃ ইয়াসিনের কথায় মিঃ হারুন একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—আপনি সব সময় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকেন ইন্সপেক্টার সাহেব। আপনি প্রবীণ ব্যক্তি, আপনার মধ্যে একজন জঘন্য দস্যু সম্বন্ধে এ ধরনের মনোভাব থাকা মোটেই উচিত নয়।

মিঃ ইউসুফ নতুন গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টার, তিনি বলে উঠেন—দীর্ঘ দশ বছর ধরে দস্যু বনহুর দেশবাসীকে জ্বালাতন করে মারছে অথচ আজ পর্যন্ত আটক করা গেলো না। পুলিশ বিভাগ হিমসিম খেয়ে গেছে।

শুধু দেশবাসীকেই নয়, দস্যু বনহুর কান্দাই পুলিশ বাহিনীকেও কম জ্বালাতন করেনি। প্রতিটি পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগকে সে জ্বালাতন করে মেরেছে। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ হাসান।

মিঃ জাফরী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন—যা গত হয়ে গেছে তা নিয়ে আলোচনা করে কোনো ফল হবে না। দস্যু বনহুর সবাইকে জব্দ এবং নাজেহাল কম করেনি। এতদিন সে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো...

হুসনা বলে উঠে—সে গা ঢাকা দিয়েছিলো না, বিপদে পড়েই সে কুন্দল দ্বীপে আটকে পড়েছিলো।

একমুখ ধোঁয়া সম্মুখে ছুড়ে দিয়ে একটু হেসে বললেন মিঃ জাফরী—নাহলে এতদিনে সে আরও কত দুস্কর্ম করে ছাড়তো কে জানে।

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হয়। পরক্ষণেই কান্দাই শহরে স্বনামধন্য খান বাহাদুর ফিরোজ রিজভী হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করেন। তাঁর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। কতকটা মৃতের ন্যায় ফ্যাকাশে লাগছে তাঁর মুখমন্ডল।

শহরের প্রায় সকলেই চেনে ফিরোজ রিজভীকে। কারণ কান্দাই এর সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি বলা চলে তাকে। পুলিশ বিভাগের সহায়তা তাঁর সর্বক্ষণ কাম্য ,তাই পুলিশ অফিসারগণ তাঁর বন্ধুলোক। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে পার্টিতে দাওয়াত হয়ে থাকে পুলিশ অফিসারগণের। দস্যু বনহুরের ভয়ে তিনি কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে বছর দু' হলো দেশে ফিরে এসেছেন। লোকসমাজে তাঁর নাম-ডাক অনেক, কারণ আজকাল যার অর্থ আছে সেই তো নামী লোক। দু'বছর হলো দেশে ফিরে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, কোনো বিপদ আসেনি তাঁর সম্মুখে।

খান বাহাদুর ফিরোজ রিজভীকে এভাবে হন্তদন্তভাবে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতে দেখে পুলিশ অফিসারগণ একটু হতভম্ব হয়ে পড়েন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ জানান।

মিঃ জাফরী হাত বাড়িয়ে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললেন—কি ব্যাপার বলুনতো খান বাহাদুর সাহেব?

ফিরোজ রিজভী আসন গ্রহণ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। এই দেখুন মিঃ জাফরী। পকেট থেকে একটা খাম বের করে হাতে দিলেন মিঃ জাফরীর।

মিঃ জাফরী খামখানা হাতে নিতেই সবাই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তাঁর হাতের দিকে।

মিঃ জাফরী ততক্ষণে খামের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে ফেলেছেন—লাল চিঠি। প্রায় একসঙ্গে সবাই বলে উঠলেন—দস্যু বনহুরের লাল চিঠি দেখছি।

ফিরোজ রিজভী বলে উঠেন—হাঁ, আপনাদের অনুমান সত্য। ওটা দস্যু বনহুরেরই লাল চিঠি ।

হুসনার চোখেমুখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এতদিন যে লোকটাকে সে একজন নিরীহ সাদাসিদা স্বাভাবিক লোক মনে করে এসেছে, আজ তাকে একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ভাবতে মন তার কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো না। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে মিঃ জাফরীর হাতের লাল চিঠিখানার দিকে।

মিঃ জাফরী চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন—

—কান্দাই শহরে পা দিয়েই শুনলাম
আপনার কু'কীর্তির কথা। বিদেশ থেকে
ফিরেও আপনি সজ্জন হতে পারেননি,
বড় দুঃখজনক কথা। এই সপ্তাহে
যে কোনো রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত
হবে। প্রস্তুত থাকবেন মিঃ রিজভী।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

দস্যু বনহুর

একবার নয়, দু'তিন বার পড়লেন চিঠিখানা মিঃ জাফরী, তারপর বললেন—মিঃ রিজভী, প্রস্তুত থাকুন দস্যু বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের আশায়।

ফিরোজ রিজভী বললেন—মিঃ জাফরী, শেষ পর্যন্ত আপনিও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

ঠাট্টা। বলেন কি মিঃ রিজভী, আমি ঠাট্টা করছি আপনার সঙ্গে?

তা নয়তো কি! আপনি জানেন, দস্যু বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাতলাভ মানে—যমদূতের সঙ্গে । না না, আমি ভাবতে পারছি না কি আমার ভাগ্যে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী—দস্যু বনহুর কান্দাইর মাটিতে পা দিয়েই জানতে পেরেছে আপনি কুকর্ম মানে কু কীর্তি করছেন মিঃ রিজভী, দস্যু বনহুরকে আমরা যত দুষ্ট আর শয়তানই বলি না কেন, সে মানুষ চিনতে ভুল করে না।

আমতা আমতা করে বলে উঠেন মিঃ ফিরোজ রিজভী—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি—আমি—

হাঁ, আপনি নিশ্চয়ই এমন কোনো কিছু করে যাচ্ছেন যা লোক সমাজে দোষণীয়।

মিঃ জাফরী, আপনি এ কথা বলছেন?

না বলে পারছি না, কারণ আপনি আমাদের যতই ঘনিষ্ঠ বন্ধুলোক হোন না কেন, অসৎ কাজ সব সময় অসৎই জানবেন।

তাহলে আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতে চান না?

আমরা অক্ষম মিঃ রিজভী।

ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে মিঃ জাফরীর এ ধরনের আচরণ ইতিপূর্বে পুলিশমহলের কেউ লক্ষ্য করেননি। সবাই অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন।

মিঃ হাসান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মিঃ জাফরী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—কোনো উপায় নেই দস্যু বনহুররের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার।

ফিরোজ রিজভী প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন—তাহলে আমি দস্যু বনহুরের হাতে মারা পড়বো? আপনারা পুলিশমহল আমাকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই নেবেন না?

মিঃ জাফরী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সিগারেটের শেষ অংশটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন—চেষ্টা করেও আপনাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না মিঃ রিজভী। আপনি যদি আপনার কু'কীর্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন তাহলে হয়তো দস্যু বনহুর আপনা আপনিই আপনাকে রেহাই দেবে।

এটাই কি আপনার শেষ কথা মিঃ জাফরী?

হাঁ, সোফায় ঠেশ দিয়ে বললেন মিঃ জাফরী।

ফিরোজ রিজভী দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলেন—আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের এই কি পুরস্কার?

শিথিল কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী—কোনো উপায় নেই খান বাহাদুর সাহেব।

মিঃ আহসান বলে উঠলেন—মিঃ জাফরী, একজন নিরীহ মানুষ এভাবে নাজেহাল হবে আর তথা আমরা নীরবে তা সহ্য করে যাবো?

মিঃ আহসান, আপনি জানেন না দস্যু বনহুর কত চতুর। একবার নয়, এমনি বহুবার আমরা...কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মিঃ জাফরী, তারপর বললেন—মিঃ রিজভী, আপনি বাসায় ফিরে যান। দস্যু বনহুর যেভাবে আবির্ভূত হয়েছে তাতে তাকে দমন করা হঠাৎ সহজ হয়ে উঠবে না। কাজেই আমরা অক্ষম।

মিঃ জাফরী।

হাঁ মিঃ রিজভী, আপনি চিঠি নিয়ে চলে যান এবং দস্যু বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আশায় অপেক্ষা করুন।

মিঃ রিজভীর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। তিনি টেবিল থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন।

যে ফিরোজ রিজভীর প্রতাপে দেশবাসীর অবস্থা একদিন ত্রাহি ত্রাহি ছিলো, সেই ফিরোজ রিজভী আজ একেবারে যেন মাটির মানুষ বনে গেছেন।

ফিরোজ রিজভী বেরিয়ে যেতেই মিঃ হারুন বলে উঠলেন—এমন সুযোগ পেয়েও আমরা হেলায় হারাবো? মিঃ জাফরী, ফিরোজ রিজভীকে এভাবে বিদায় না করে তাকে সাহায্য করা আমাদের....

উচিত ছিলো, এই তো?

হাঁ স্যার।

দেখুন মিঃ হারুন, কি করতে হবে একথা এখন আমরা ভাববো। মিঃ রিজভী জানবেন তাঁকে আমরা সাহায্য করছি না কিন্তু গোপনে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। মিঃ আহসান, আজ রাত থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে মানে রাখবেন।

মিঃ আহসান এ কথাই বলতে চাইছিলেন। মিঃ জাফরী বলায় তিনি দীপ্তকণ্ঠে বললেন নিশ্চয়ই মানে থাকবে।

মিঃ জাফরী এবার মিঃ আহসানকে লক্ষ্য করে বললেন—পুলিশ বাহিনী নিয়ে আপনি প্রস্তুত থাকবেন মিঃ হাসান, কারণ দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই এ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনো রাতে মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়িতে হানা দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ হাসান বললেন—আচ্ছা স্যার, আমি আপনার নির্দেশমত কাজ করবো।

মিঃ ইয়াসিন।

বলুন স্যার?

আপনিও তৈরি থাকবেন। আজ রাত থেকেই মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ি ঘেরাও রেখে পাহারা দিতে হবে। বাড়ির চারপাশে চারখানা মেশিনগান বসিয়ে নেবেন, শুধু রাইফেল আর রিভলভারে কাজ হবে না। হাঁ, মেশিনগানগুলো এত গোপনে বসাতে হবে যেন বাইরের একটা পিঁপড়াও জানতে না পারে।

আচ্ছা স্যার।

মিঃ আহসান, আপনি যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবার হয়তো তা সার্থক হবে। আমাদের কৌশলে কাজ করতে হবে। দস্যু বনহুরকে এতদিন জীবিত পাকড়াও করবো বলে যে প্লান করেছিলাম এবার সে প্ল্যান পাল্টে নিলাম। তাকে জীবিত পাকড়াও করা সম্ভব না হলে নিহত অবস্থায় তাকে আমাদের চাই। ১৯৬৯ সালে সে আমাকে যেভাবে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছিলো তা কোনোদিন ভুলবো না। সে শুধু আমাকে অপমান করেনি,. সমস্ত কান্দাই পুলিশ বাহিনীর মর্যাদা হানি করেছে। সে রাগ আমার মরলেও যাবে না।

সেদিন বৈঠক শেষ হলো।

হুসনার মনটা ব্যথা-বেদনায় গুমড়ে কেঁদে উঠছিলো। মিঃ চৌধুরী, যে তাকে ভয়ঙ্কর কবল থেকে নানাভাবে উদ্ধার করে নিয়ে এলো, যার মহৎ ব্যবহারে সে আত্মহারা, সেই মহান ব্যক্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হুসনা গাড়িতে বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হু হু করে কান্না আসছিলো তার অতিকষ্টে কান্না চেপে বসেছিলো সে।

পাশেই মিঃ আহসান।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে।

কন্যাকে একেবারে নীরবে বসে থাকতে দেখে বলেন মিঃ আহসান —হুসনা মা, সব শুনলে তো? কি আশ্চর্য, যে দস্যু কিনা সুন্দর ভদ্রবেশে তোমাকে নিয়ে এসে হাজির আমার বাসভবনে?

এতে আবার আশ্চর্য হাবার কি আছে আব্বা? দস্যু. হলেও সে মানুষ তো?

মা, তুমি এই দস্যু সম্বন্ধে বেশি কিছু জানো না তাই এ ধরনের কথা বলছো।

সব তো শুনলাম আব্বা আজ তোমাদের অফিসে বসে।

তা কতটুকু শুনেছো। যা শুনলে তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি সে অত্যাচারী—

আব্বা, তোমরা যতই বলো; মিঃ চৌধুরীই যদি দস্যু বনহুর হয় তাহলে সে অত্যাচারী নয় বা হতে পারে না, এ আমি জানি এবং বিশ্বাস করি। এমন মহৎ লোক আমি কোনোদিন দেখিনি। কথাটা বলে উদাস নয়নে তাকালো সে বাইরের দিকে।

গাড়ি ছুটেছে উল্কাবেগে।

মিঃ আহসান আর কোনো কথা না বাড়িয়ে নিশ্চুপ রইলেন। তিনি একমনে সিগারেট পান করে চলছেন এবং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

❑

সর্দার।

কে?

ইউসুফ আলী।

এসেছো?

হাঁ সর্দার।

সংবাদ কি?

আজ রাতের বোইং-এর ফিরোজ রিজভী কান্দাই ত্যাগ করে হিন্দল যাচ্ছে।

বনহুর তার শহরে আস্তানার ভূগর্ভের একটা কক্ষের শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে ছিলো। এবার সে উঠে সোজা হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ইউসুফের মুখে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ফিরোজ রিজভী যাতে যেতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তাকে শুধু সমুচিত শাস্তি দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি জানি সে এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে চায় কিন্তু সে সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। কিউকা থেকে তার যে মাল আসছিলো সে মাল কবে কান্দাই এসে পৌঁছবে সে সংবাদ কি পেয়েছো?

কাসেম সে সংবাদ জানে সর্দার।

যাও কাসেমকে পাঠিয়ে দাও। আর শোনো, একটি চিঠি পুনরায় ফিরোজ রিজভীর নিকটে পৌঁছে দাও যেন সে আজ রাতে যাওয়া বন্ধ করে।

সর্দার, পুলিশ প্রধান ফিরোজ রিজভীর জবাব দিয়ে দিয়েছেন পুলিশবাহিনী তাকে কোনোরকম সাহায্য করবে না।

ইউসুফ, পুলিশবাহিনী ফিরোজ রিজভীকে সাহায্য না করতে চাইলেও পুলিশবাহিনী ঠিকই পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ফিরোজ রিজভী জানে না বলেই সে কান্দাই ত্যাগ করে পালাতে চাচ্ছে। বনহুর প্যাড থেকে চিঠিখানা

ছিড়ে নিয়ে ভাঁজ করে একটা খামে ভরে ইউসুফের হাতে দিয়ে বললো—এটা আজ বিকেলের মধ্যেই যেন ফিরোজ রিজভীর হাতে পৌঁছে।

আচ্ছা সর্দার।

যাও, কাসেমকে পাঠিয়ে দাও।

বেরিয়ে গেলো ইউসুফ আলী।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। দীর্ঘ আড়াই কিংবা তিন বছর হবে সে কান্দাই ত্যাগ করেছিলো। শুধু কান্দাই নয়, তার স্ত্রী-পুত্র-মা এবং অনুচরগণ সবাইকে সে ত্যাগ করে গিয়েছিলো। এই দীর্ঘ দিনের পর সে ফিরে এসেছে কিন্তু এখনো সে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। এখনও সে আস্তানায় যায়নি। তাজকে সে এখনও কাছে পায়নি, এসেই জড়িয়ে পড়েছে নতুন এক ঘটনাচক্রের সঙ্গে।

ফিরোজ রিজভী নতুন নাম নয়, কান্দাই শহরের পুরোন নাম। বহুদিন থেকে সে কান্দাই শহরে বাস করে আসছে। প্রথমে ছোটখাটো ব্যবসা করতো এখন সে কোটিপতির চেয়ে অধিক। গোপনে সে দেশ থেকে খাদ্য সম্পদ বিদেশে পাঠিয়ে বিদেশ থেকে মাদক দ্রব্যাদি আমদানী করে থাকে। এতে দেশে খাদ্যঘাটতি চরম আকার ধারণ করে এবং দেশবাসী কঠিন সমস্যায় পড়ে।

বনহুর ফিরে এসেই জানতে পারলো এই সংবাদ। রহমান বা বনহুরের অন্য কোনো অনুচর এখনও ফিরোজ রিজভীর এই অন্যায় ব্যবসায়ে বাধাদান করেনি। তারা গোপনে সব সংবাদ সংগ্রহ করে রাখছিলো।

বনহুর সব শুনে অগ্নিবর্ণ ধারণ করে বলেছিলো—এমন লোককে তোমরা আজও শায়েস্তা করোনি কেন?

ইউসুফ বা অন্য কেউ এর জবাব দিতে পারেনি।

বনহুর ওয়্যারলেসে রহমানের সঙ্গে কথা বলে তার আগমনবার্তা আস্তানায় জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কখন সে আস্তানায় আসছে তা সঠিকভাবে বলেনি। রহমান সংবাদ পেয়েই রওয়ানা দিয়েছে, সর্দারের সঙ্গে তার যে অনেক কথা আছে।

কিন্তু সে এখনো এসে পৌঁছেনি।

বনহুর সিগারেট পান করছিলো আর ভাবছিলো নানা কথা। এমন সময় ইউসুফ এবং কাসেম প্রবেশ করে সেখানে। কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ায় কাসেম। ইউসুফ বেরিয়ে যায়।

বনহুর বলে—তুমি যে সংবাদ জানার জন্য গিয়েছিল তা জেনে এসেছো কাসেম?

হাঁ সর্দার, আমি সেই সংবাদ জানানোর জন্যই আসছিলাম এমন সময় ইউসুফ আমাকে জানালো আপনি ডাকছেন।

বলো?

সর্দার, আগামীকাল রাতে কিউকা থেকে ফিরোজ রিজভীর বহু মাল কান্দাই এসে পৌছবে এবং সে মাল তার গুদামে না গিয়ে সোজা পাঠানো হবে কান্দাইয়ের রসুলপুরে কোনো এক গোপন স্থানে।

শুনলাম ফিরোজ রিজভী কান্দাই ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে?

হাঁ সর্দার, কিন্তু সে পালালেও তার বিশ্বস্ত লোকজন আছে, তারাই তার ব্যবসা দেখাশোনা করতে পারবে।

কে কে তাকে এই অসৎ ব্যবসায়ে সাহায্য করছে সংবাদ নিয়েছো?

এমন সময় পেছন থেকে মোহসিন এসে দাঁড়ায় সর্দার, আমি এসব সংবাদ সংগ্রহ করে রেখেছি। একখানা কাগজ বের করে— হাতে দেয় বনহুরের এতে লেখা আছে।

বনহুর হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে মোহসিনের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়তে থাকে। একটু স্পষ্টভাবেই সে উচ্চারণ করে পড়ে—মীর ইউনুস, হায়দার আলী খান, হুসাইন মিয়া, আলী আসগর রিজভী......পড়তে পড়তে চোখ তুলে তাকালো বনহুর—আলী আসগর রিজভী কে? এ কি এদের দলের লোক, না ফিরোজ রিজভীর কোনো আত্মীয়?

সর্দার, ফিরোজ রিজভীর ছোট ভাই হয় এই আলী আসগর রিজভী— তবে আপন ভাই নয়, চাচাতো ভাই।

হুঁ। পুনরায় পড়তে শুরু করে বনহুর—জাফর হোসেন, কালু মিয়া......পড়া শেষ করে চোখ তুলে তাকায় বনহুর মোহসিনের দিকে—এরা সবাই তার ব্যবসার সহায়ক?

হাঁ। সর্দার।

আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

মোহসিন এবং কায়েস বেরিয়ে যায়।

একটা অনুচর একটা রেকাবিভর্তি ফলমূল এনে রেখে যায় বনহুরের সম্মুখের টেবিলে। আর এক গেলাস দুধ।

বনহুর রেকাবি থেকে ফল তুলে নিয়ে সবেমাত্র মুখে দিতে যাবে অমনি রহমান এসে দাঁড়ায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাকে—সর্দার!

বনহুর হাত থেকে ফলটা পুনরায় রেকাবিতে রেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায় এবং রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—রহমান, কেমন আছো।

ভালোই আছি সর্দার।

বসো।

রহমান আসন গ্রহণ করে।

বনহুর হাস্যোজ্জল মুখে বলে—মা কেমন আছে?

তিনি এবং বৌরাণী ও নূর ভাল আছেন। নূর এবার তার ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সত্যি রহমান?

হাঁ সর্দার।

শুনে খুশি হলাম অনেক। হতভাগ্য পিতা আমি এত আনন্দেও তাদের পাশে থাকতে পারিনি। রহমান, আস্তানার সংবাদ?

আস্তানায় সবাই ভালো। জাভেদকে আমি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, সেও এবার পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেছে।

চমৎকার। রহমান, তুমি শুধু আমার সহকারী নও, তুমি আমার পরম আপনজন। তুমি না থাকলে আমি এতদিন কোথায় হারিয়ে যেতাম কেউ আমাকে খুঁজে পেতো না। বন্ধু তুমি আছো বলেই আমি যেখানে সেখানে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

সর্দার, আস্তানায় সবাই আপনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

জানি। রহমান, আস্তানায় সবার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমিও কি কম ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়েই আস্তানা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে।

সব ইউসুফের কাছে শুনেছি সর্দার।

হাঁ, আমি এই শয়তানকে শায়েস্তা না করে আস্তানায় যাবো না। সে দু'বছরে কান্দাইবাসীর যা সর্বনাশ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে।

সর্দার, কান্দাই পুলিশবাহিনী আপনার আগমনবার্তা জানতে পেরে ভীষণভাবে আয়োজন শুরু করেছে।

এটা নতুন কিছু নয় রহমান।

সর্দার, এরা এবার...

নতুন ফন্দি আঁটছে, এই তো?

হাঁ। শুধু তাই নয়, চৌধুরীবাড়ির চারপাশে বেড়াজালের মতো ঘিরে পাহারার ব্যবস্থা করছে। সর্দার, সদাসর্বদা পুলিশ অফিসার বাড়িখানায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠে বনহুরের, বলে সে—কি বললে, বাড়িতে সদা-সর্বদা খানা-তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ অফিসারগণ?

হাঁ সর্দার।

পুলিশবাহিনী বাড়ির উপর কড়া নজর রেখে পাহারা দিক তাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু সব সময় কারণে-অকারণে বাড়ি খানাতল্লাশি চালানো, এটা বড় অসুবিধাজনক, কারণ এখন নূর বড় হয়েছে।

কথা শেষ না করে চিন্তিত হয়ে পড়ে বনহুর, তার মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে ওঠে।

রহমান বলে—নূর এখনো কিছু জানতে পারেনি তবে তার কাছে এভাবে বেশি দিন এ ব্যাপার চাপা দিয়ে রাখা হয়তো সম্ভব হবে না বলে মনে হয়।

ঠিকই বলেছো রহমান। নূর বড় হচ্ছে, এ সব ঘটনা তার মনে নিশ্চয়ই সন্দেহের বীজ বপন করবে। একটু চিন্তা করে বলে বনহুর—রহমান, নূরকে বিদেশ পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোটাই ভাল মনে হয়।

আনন্দ-উল্লাসিত কণ্ঠে বলে রহমান সর্দার, ঠিক বলছেন, ঠিক বলছেন, নূরকে বিদেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোই ভালো। এতে তার পড়াশোনা ভাল হবে এবং দেশের নানা ঘটানা তাকে ভাবিয়ে তুলবে না।

হাঁ, সেই ব্যবস্থা করো রহমান। নূর এখন খুব ছোট্ট বাচ্চা নেই, সে মাকে ছেড়ে নিশ্চয়ই বিদেশে থাকতে পারবে। কথাটা তুমি মনিরার কাছে তুলতে পারো।

আচ্ছা সর্দার, বলবো।

নূরী, জাভেদ, নাসরিন, ফুল কেমন আছে রহমান?

সবাই ভালো আছে।

ও, তুমি একটু পূর্বে বলেছো ওরা সবাই ভালো আছে তবু খেয়াল ছিলো না। অনেকদিন হলো দেখি না তাই মনটা....যাক, এবার বলো বাংলাদেশের সংবাদ কি?

বাংলাদেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন সর্দার। ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও গোপনে সেখানে নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

নতুন জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশ। অসুবিধা অনেক থাকবে এবং হবে। হানাদার বাহিনী বহু ক্ষতি করেছিলো, তারপর আবার যদি ষড়যন্ত্রকারীরা উৎপাত শুরু করে তাহলে বিধ্বস্ত বাঙ্গালী জাতি মরিয়া হয়ে উঠবে, তাতে কোনো ভুল নেই। ইচ্ছা আছে আবার বাংলাদেশে যাবো।

তাহলে খুবই ভালো হতো কিন্তু চট্ করে আপনার যাওয়া সম্ভব হবে না সর্দার, কারণ বহুদিন আপনি কান্দাই ছাড়া। এদিকে যেসব দুর্নীতি অনাচার চলেছে তা অবর্ণনীয়।

তোমরা কি করছিলে এতদিন?

সর্দার, আপনার কোনো সংবাদ না পেয়ে আমরা সবাই মুষড়ে পড়েছিলাম। কোনো কাজে কারও উৎসাহ ছিলো না। তা ছাড়া

বলো থামলে কেন?

তা ছাড়া আপনার প্রতিক্ষায় ছিলাম সর্দার। শুধু ফিরোজ রিজভী নয়, তার দলবল সবাইকে শায়েস্তা করতে হবে।

হাঁ, তা করতেই হবে।

সর্দার, আমি প্রথম প্রথম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যখন জানতে পারলাম ফিরোজ নামক এক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ব্যবসা করে চলেছে। কারণ পুলিশ অফিসার একজন ছিলেন, নাম তাঁর ফিরোজ রিজভী।

হাঁ, ঠিক বলেছো রহমান, প্রথমে আমারও সেই রকম মনে ধোঁকা লেগেছিলো। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম এ ফিরোজ রিজভী খান বাহাদুর নামধারী এক শয়তান ব্যবসায়ী। বেশ কিছুদিন কান্দাই ত্যাগ করে বিদেশে গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে ছিলো। বিদেশে থেকে সুবিধা করতে না পেরে পুনরায় ফিরে এসেছে কান্দাই শহরে এবং কান্দাইবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চালান করছে বাইরে...কথা না শেষ করে দাঁতে দাঁত পিষে বনহুর।

❑

স্যার চিঠি।

চিঠি!

ফিরোজ রিজভী বয়ের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে কম্পিত হাতে মেলে ধরে। লাল চিঠি। পড়ে যায় এক নিঃশ্বাসে—

ফিরোজ সাহেব, আপনি হিন্দল যাবেন মন-
স্থির করেছেন কিন্তু সাবধান, এ মুহূর্তে আপনি
কান্দাই ত্যাগ করে কোথাও যাবেন না।
গেলেও রেহাই পাবেন না আমার হাত থেকে।
শুধু আপনি নন, আপনার সহকারী যারা

তারাও রেহাই পাবে না। ক্ষুধার্ত জনগণের
মুখের আহার কেড়ে নিয়ে ধনপতি হবার সাধ
এবার মিটবে, প্রস্তুত থাকবেন!

—দস্যু বনহুর

ফিরোজ রিজভীর হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়লো মেঝেতে। সে আজ কান্দাই ত্যাগ করার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। সব কিছু আয়োজনও তার হয়ে গেছে। রাতের ফ্লাইটে বিদায় নেবে, এমন সময় এ চিঠি।

ফিরোজ রিজভীকে বিদায় দেবার জন্য গোপনে তার সহকারিগণ এসেছে তার বাড়িতে। ফিরোজ রিজভীর বিশ্রামকক্ষে সবাই ঘিরে রেখেছে তাকে। চিঠিখানা যখন ফিরোজ রিজভীর হাত থেকে খসে পড়লো তখন আলী আসগর রিজভী চিঠিখানা তুলে নিলো হাতে তারপর চাপাকণ্ঠে চিঠিখানা পড়তে লাগলো।

বয় যখন ফিরোজ রিজভীর হাতে চিঠিখানা এনে দিয়েছিলো তখনই ফিরোজ রিজভীর সহকারিগণ অনুমান করে নিয়েছিলো এ চিঠি নিশ্চয়ই লাল চিঠি হবে। চিঠি যখন খাম থেকে বের করে নিলো তখন সহকারিদলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, কারণ লাল চিঠিখানা কার তারা জানে।

চিঠিখানা পড়ে আলী আসগর রিজভী তাকালো অন্যদের মুখে। সবাই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কক্ষে পূর্ণ নীরবতা, একটি সুচ পড়ার শব্দ শোনা যাবে। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

মিঃ আলী হায়দার খান বলে উঠলো—রিজভী সাহেব, আপনি এ চিঠির জন্য মোটেই ভয় পাবেন না। এমনভাবে আপনাকে নিয়ে আমরা উধাও হবো দস্যু বনহুরের সাধ্য নেই সে টের পায়।

মীর ইউনুস বলে উঠলো—দস্যু বনহুরের চেয়ে আমরা কম কিসে? সেও মানুষ আমরা মানুষ। রিজভী সাহেব, আপনি মোটেই ভড়কে যাবেন না। আজ রাতেই আমরা কান্দাই ত্যাগ করবো।

মুখে যতই বলুক না কেন, ভিতরে ভিতরে সবাই ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলো। ফিরোজ রিজভীর অনুচরদের মনোভাব, এ মুহূর্তে যদি রিজভী ভয় পেয়ে কান্দাই ত্যাগ করা থেকে ক্ষান্ত হয় তাহলে তাদেরও বিপদ আসন্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপাততঃ ব্যবসার মায়া বিসর্জন দিয়ে ফিরোজ রিজভী এবং তার দলবল সবাই কান্দাই থেকে সরে যাবার যোগাড়ে আছে।

বললেন আসগর রিজভী—কিভাবে আমরা সরে পড়তে পারি যাতে দস্যু বনহুর দূরের কথা, এই বাড়িতেও কেউ যেন জানতে না পারে।

হাঁ, সত্যি এ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে। বললো ইউনুস খান।

কিছুক্ষণ নীরব সবাই।

হঠাৎ বলে উঠলো হুসাইন মিয়া। সে এতক্ষশণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলো, বললো—আজ রাতে না গিয়ে খুব সকালের ফ্লাইটে যাত্রার আয়োজন করতে হবে। যারা যারা সকালের ফ্লাইটের যাত্রী, তাদের যাত্রা বন্ধ করে ফ্লাইটের টিকেট সংগ্রহ করতে হবে এবং সে দায়িত্বভার আমি নিচ্ছি।

হুসাইন মিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত কথায় সবাই খুশি হলো। এতক্ষণে যেন ভরসা খুঁজে পেলো তারা।

রিজভীর মুখ কিন্তু তেমনি গম্ভীর ভাবাপন্ন রয়েছে, বললো— বিমান বদল করে কি ফল হবে বুঝতে পারছি না। দস্যু বনহুর জানতে পেরেছে আমি বা আমার দলবল কান্দাই ত্যাগ করতে যাচ্ছি। কখন কোন্ বিমানে যাচ্ছি এ সংবাদ সে নিশ্চয়ই জানতে পারবে।

বললো হুসাইন মিয়া—রিজভী সাহেব, দস্যু বনহুর জানে আপনি রাতের বিমানেই হিন্দল রওয়ানা দেবেন, কাজেই সে ঐ বিমানে আক্রমণ চালাতে পারে। বিমান বদল করলে কিছুতেই সে জানতে পারবে না। বিশেষ করে অতি সাবধানতার সঙ্গে কাজ করবো।

বললো ফিরোজ রিজভী—বেশ, আপনি যদি অতি সাবধানে বিমান বদলের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে রাজি আছি। কিন্তু আপনারা সবাই গেলে চলবে না, কারণ আমি হিন্দল না গিয়ে মুর্শিদাবাদ বিমান বন্দরে নেমে যাবো। সেখানে আত্মগোপন করে আমার ব্যবসা আমি চালিয়ে যাবো।

আপনারা দু'চোর জন কান্দাইয়ে আত্মগোপন করে ছদ্মনামে আমার ব্যবসায় সহায়তা করবেন।

মীর ইউনুস বললো—বেশ, আমরা তিনজন কান্দাই থাকতে রাজি আছি।

আমি খুশি হলাম আপনাদের কথা শুনে। বললো ফিরোজ রিজভী।

একদিকে মৃত্যুভয় আর একদিকে অর্থলোভ।

ফিরোজ রিজভী এবং তার দলবল কয়েক বছর ধরে নানাভাবে কৌশলে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে বহু অর্থ উপার্জন করেছে।

আজ যমদূত সম দস্যু বনহুরের চিঠি পেয়েও তাদের সেই অর্থের মোহ কাটলো না। তারা গা ঢাকা দিয়ে তবু ব্যবসা চালিয়ে যাবে, তারই সলা-পরামর্শ করছিলো।

এখানে যখন রিজভীর বাসভবনে গোপনে নানারকম গোপনীয় কথাবার্তা চলছিলো তখন পুলিশ অফিসে পুলিশপ্রধান তাঁর পুলিশ বাহিনীকে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য রিজভীর বাড়ির আশেপাশে কিভাবে আত্মগোপন করে থাকবে, তার জন্য বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঠিক কায়দামত প্রতীক্ষা করবে তা শিখিয়ে দিচ্ছিলেন ভালোভাবে।

ঠিক ঐ সময় দস্যু বনহুর জমকালো ড্রেসে সজ্জিত হয়ে পায়চারী করছিলো তার শহরের আস্তানার বিশ্রামকক্ষে।

রহমান একপাশে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে সে তাকিয়ে দেখছিলো সর্দারের দিকে। কক্ষে উজ্জ্বল নীলাভ আলো জ্বলছে।

অনেক দিন পর বনহুর আজ জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়েছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের উদয় যেমন সুন্দর লাগে তেমনি জমকালো পোশাকে বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো।

বনহুর তাজের জন্য অপেক্ষা করছে।

শহরের আস্তানা থেকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে তাজকে নিয়ে কায়েস যেন চলে আসে।

এখন রাত বেশি না হলেও একেবারে কম নয়। শীতের রাত, দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সমস্ত শহরটা ঝিমিয়ে পড়েছে যেন। সন্ধ্যা থেকেই আজ কুয়াশা পড়ছিলো, তাই ঝাপসা লাগছে।

পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থেমে পড়ে বললো বনহুর—রহমান, কুয়াশা পড়া কি শুরু হয়েছে।

হাঁ সর্দার, বাইরে ভীষণ কুয়াশা পড়েছে।

যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে রহমান। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্দার, বেশ কিছুদিন হলো এমন কুয়াশা পড়েনি, আজ খুব বেশি কুয়াশা পড়ছে। সর্দার...

বলো রহমান?

পুলিশবাহিনী ফিরোজ রিজভীর বাড়ির আশেপাশে বেড়া জালের মত ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। তারা নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র এমন কি মেশিনগান পর্যন্ত পেতে রেখেছে।

জানি রহমান! সত্যি, পুলিশ অফিসারগুলোর নির্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ হয়। অযথা বেচারা পুলিশগুলোকে হয়রান-পেরেশান করে ছাড়ছে। কনকনে শীত পড়েছে, ওদের কথা ভেবে দেখতো একবার?

মিথ্যা নয় সর্দার, যা শীত পড়েছে। দুদিন আগেও এমন হাড়কাঁপুনি শীত ছিলো না।

রহমান, জানো মাঝে মাঝে পুলিশগুলোর জন্য বড় মায়া হয়। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য কত পরিশ্রম করে ওরা। পরিবার পরিজনের জন্য ওরা বেছে নিয়েছে এই পুলিশের চাকরী, নাহলে কেউ ওরা সখ করে এ চাকরি গ্রহণ করেনি বা করে না।

সর্দার, বৌরাণী বলেছিলেন আপনি এলে সর্বপ্রথমে যেন চৌধুরীবাড়ি যান!

কিন্তু কি করে তা সম্ভব রহমান? যে দুর্বৃত্ত-শয়তানরা দেশবাসীর মুখের আহার কেড়ে এক একটা টাকার কুমীর বনে আজ দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদের শায়েস্তা না করে কোথাও যেতে পারি না। দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো উচ্চারণ করে বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ হয় তার।

ঐ সময় বাইরে অশ্বখুরের শব্দ শোনা যায়।

রহমান বলে—সর্দার, তাজ এসে গেছে।

একটু পরেই কক্ষে প্রবেশ করে কায়েস, সে কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কায়েসের চোখেমুখে দীপ্ত আনন্দ-উচ্ছল ভাব ফুটে উঠেছে। কতদিন পর সর্দারকে সে দেখতে পেলো।

বনহুর কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো—ভালো আছো?

হাঁ সর্দার।

এত তাড়াহুড়ার মধ্যেও সর্দার তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করায় মনে মনে খুশি হলো কায়েস।

বনহুর টেবিল থেকে রিভলভারখানা তুলে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রেখে রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি, কেশবচাঁদ এবং জবরুকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি তোমরা সেইভাবে কাজ করবে।

এক্ষুণি যাবো সর্দার? বললো রহমান।

বনহুর প্যান্টের অপর পকেট থেকে ছোট ঘড়িটা বের করে বললো—এখন নয়, রাত তিনটায় তোমরা রওয়ানা দেবে।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর দ্রুত বেরিয়ে যায়।

তার বুটের ভারী আওয়াজ মিশে যায় অন্ধকারে।

অল্পক্ষণ পরেই শোনা যায় তাজের খুরের আওয়াজ।

❑

একখানা কালো শব্দহীন গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। এরোড্রামের পাশে এসে থামলো গাড়িখানা, মিঃ রিজভী এবং তার সহকারী চারজন গাড়ি থেকে নেমে কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে বিমান বন্দরের দিকে এগুলো।

বিমানখানা ফ্লাইংয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

যাত্রীরা প্রায় উঠে বসেছে।

এমন সময় মিঃ রিজভী ও তার সঙ্গীরা বিমানে উঠে নিজ নিজ আসনে বসলো। মিঃ রিজভী ও তার সঙ্গীদের চোখে মুখে ভীত আতঙ্কিত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বারবার তারা তাকাচ্ছে বিমানের জানালা দিয়ে বাইরে এরোড্রামের দিকে। যদিও কুয়াশার জন্য কিছু নজরে পড়ছিলো না তবু তারা তাকাচ্ছে।

বিমান আকাশে না উঠা পর্যন্ত কারো মনে স্বস্তি বা শান্তি ছিলো না। কান্দাইয়ের জাহাঙ্গীরাবাদ থেকে কান্দাই বিমান বন্দরে আসতে ফিরোজ রিজভী তার দলবলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো।

বাড়ি থেকে যখন তারা বের হলো তখন প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেছে এই বুঝি দস্যু বনহুর তাদের সম্মুখে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এই বুঝি তাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। এই বুঝি গুলি এসে বিদ্ধ হলো তাদের বুকে।

না, এসব কোনো কিছুই ঘটলো না। ভালোয় ভালোয় তারা এসে পৌঁছলো। কিন্তু বিমান আকাশে না উড়া পর্যন্ত তারা স্বস্তি পাচ্ছে না। ঘন কুয়াশার জন্য বিমান উঠতে বিলম্ব হচ্ছে। ফিরোজ রিজভীর মনে তখন নানা দুশ্চিন্তা বাড়ি থেকে যখন বের হলো তখন সে ভাবতে পারেনি এরোড্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। সঙ্গে তাদের শুধু এক একটা এটাচী ব্যাগ ছিলো মাত্র। যখন তারা বাড়ির বাইরে বের হলো তখন এক একজনের বুক টিপ্ টিপ্ করছিলো। তাদের জন্য যেন গাড়ি অপেক্ষা করছিলো সেটা ছিলো গেটের বাইরে অন্ধকারে।

পুলিশবাহিনীর নজর এড়াতে পারেনি গাড়িখানা। পুলিশ সুপারের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশবাহিনী অন্ধকারে আত্নগোপন করে রিজভীর বাড়িখানার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছিলো। শুধু পুলিশবাহিনী নয়, তাদের মেশিনগান ও রাইফেলগুলোর মুখও সোজা হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো যেন কেউ তাদের সম্মুখে দিয়ে চলে যেতে না পারে।

অন্ধকারে গাড়িখানা এসে যখন দাঁড়ালো তখন পুলিশবাহিনী সতর্ক এবং সজাগ হয়ে উঠেছিলো...একটি হুইসেলের প্রতীক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠবে পুলিশবাহিনীর মেশিনগানগুলো।

কিন্তু কোনো হুইসেলের শব্দ হলো না। পুলিশপ্রধান কোনো আওয়াজ না দেওয়ায় পুলিশবাহিনী বুঝতে পারলো, এ গাড়িখানা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের নয়।

পুলিশপ্রধান মিঃ জায়েদী নিজে পাওয়ারফুল বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছিলেন চারদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন রাত হলেও পাওয়ারফুল বাইনোকুলারে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন গাড়িখানা এসে থামলো রিজভীর বাড়ির বাইরে গেটের আড়ালে তখন মিঃ জায়েদী দেখলেন গাড়ি ফাঁকা, শুধুমাত্র ড্রাইভার বসে আছে ড্রাইভিং আসনে। আরো লক্ষ্য করলেন ড্রাইভার গাড়ি ত্যাগ না করে ঠিক তার আসনে বসে রইলো।

প্রথমে সন্দেহ হলেও পরে সন্দেহ রইলো না, তিনি বুঝতে পারলেন গাড়িখানা দস্যু বনহুরের নয়।

একটু পরে বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে চারজন লোক। মিঃ জায়েদী চিনলেন—মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীদের তিনজন—তারাও ফিরোজ রিজভীর লোক। তিনি বুঝতে পারলেন রিজভী পালিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ জায়েদী সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে মিঃ জাফরীকে জানিয়ে দিলেন ফিরোজ রিজভী দলবল নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

জবাব এলো—যেতে দিন কিন্তু বাড়ির উপর কড়া পাহারা রাখতে ভুলবেন না।

জায়েদী জানালেন—হাঁ, আমরা ঠিকমত এবং সজাগভাবে পাহারা দিচ্ছি। যদিও আমাদের পুলিশবাহিনীর শীতে খুব কষ্ট হচ্ছে তবু নব উদ্যমে প্রতীক্ষা করছে দস্যু বনহুরের।

মিঃ আহসান ছিলেন একদম বাড়ির পেছন অংশে, কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুর কোনো সময় সম্মুখ দিয়ে আসবে না। তিনি নিজে একদল পুলিশবাহিনী নিয়ে সজাগভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। যদিও তাঁর বয়স হয়েছে শীত তাঁকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে তবু তিনি নব উৎসাহে কাজ করে চলেছেন। তার মনে বিপুল উন্মাদনা, দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত্য যে অবস্থায় হোক পাকড়াও করলে তাঁর জীবন সার্থক হবে।

মিঃ আহসান যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের বিপুল উন্মাদনা নিয়ে দারুণ শীতের মধ্যেও একটি ডাষ্টবীনের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তখন তাঁর বাসায় হুসনা নিজের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। চোখে তার ঘুম নেই, কারণ তার পিতা যখন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য বিদায় নিলেন তখন থেকে তার মনে একটা ভীষণ আলোড়ন শুরু হলো, সে অসহ্য চিন্তা থেকে এখন পর্যন্ত রেহাই পেলো না।

হুসনা বিছানায় শুয়ে ছট ফট করছে আর ভাবছে তার জীবনরক্ষককে তারই পিতা এভাবে হত্যা করবে আর সে কিছু করতে পারবে না। কাল সকালে মিঃ চৌধুরীর লাশ পুলিশ অফিসের সম্মুখে হাজির করা হবে। শত শত লোক ভীড় জমিয়ে দেখবে এই সেই দস্যু বনহুর......

হঠাৎ হুসনার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে—একটা শব্দ হলো, কেউ যেন দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো বলে মনে হলো হুসনার। নানা চিন্তায় দরজার খিল আঁটতে ভুলে গিয়েছিলো সে। কে তার কক্ষে প্রবেশ করলো কে জানে। ধীরে ধীরে মুখ তুললো হুসনা, তাকালো সে দরজার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ভীতকণ্ঠে বলে উঠলো—কে! কে?

কোনো জবাব নেই।

হুসনা দেখলো, একটা জমকালো মূর্তি এগিয়ে আসছে তার বিছানার দিকে।

হুসনা ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। দু'চোখ তার ভয়ে আতঙ্কে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে।

হুসনা দেখলো ছায়ামূর্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত জমকালো ড্রেস। মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পায়ে ভারি বুট হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। কক্ষের ডিমলাইটের আলোতে চক্ চক্ করছে ভারী বুট দুটো।

হুসনা চিৎকার করতে যাচ্ছিলো অমনি ছায়ামূর্তি তার মুখে হাতচাপা দেয়—মিস হুসনা।

কে—কে আপনি...মিঃ চৌধুরী!

না, দস্যু বনহুর।

আপনি......

বনহুর ততক্ষণে মুখের কালো কাপড়খানা সরিয়ে ফেলেছে।

হুসনা তাকায়—মিঃ চৌধুরী, আপনি তাহলে সত্যি দস্যু বনহুর...

হাঁ মিস হুসনা।

হুসনা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। আজ যেন সে ঐ মুখে নতুন এক রূপ দেখতে পায়। অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ বলিষ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে ও মুখে। একটু পূর্বেই হুসনা যাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলো, যার মৃত্যুর জন্য ভীত আতঙ্কিত হচ্ছিলো সেই ব্যক্তি এই মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত। বিস্ময়ের প্রথম ধাপ অতিক্রম করতেই হুসনার মুখ দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো সে—মিঃ চৌধুরী, আপনি তাহলে—কথা শেষ না করেই থেমে যায় হুসনা।

বলে বনহুর—বলুন থামলেন কেন, তাহলে কি?

আমার বাবা পুলিশবাহিনী নিয়ে ফিরোজ রিজভীর বাড়ির আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করছেন, আপনি সেখানে গেলে আপনাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হবে।

হেসে উঠে বনহুর—তারপর হাসি থামিয়ে বলে—শুধু আপনার আব্বা নন মিস হুসনা, সমস্ত পুলিশ বাহিনীর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে কারণ এই

দারুণ শীতের রাতে অযথা কষ্ট করছেন। একটু থেমে বলে বনহুর—এই হিমঝরা রাতে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি মিস হুসনা, আপনার আব্বার শয়নকক্ষে যাবো। ও কক্ষে কি আপনার আম্মা ঘুমিয়ে আছেন?

কেন বলুন তো?

সে জবাব এখন নয়, পরে দেবো।

না, আম্মা ও কক্ষে ঘুমান না। আম্মা পাশের কক্ষে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহলে আমি আপনার আব্বার কক্ষে যেতে পারি?

বেশ যান। এই নিন চাবি, দরজায় তালাবদ্ধ আছে। একটা চাবি বনহুরের হাতে দেয় হুসনা।

বনহুর চাবি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

হুসনা ভাবতে থাকে তার আব্বার কক্ষে কি প্রয়োজন দস্যু বনহুরের? কিন্তু জবাব সে পায়নি ওর কাছে। নিশ্চয়ই টাকা পয়সা লুটে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। যাক্ তবু ভাল, তার জীবন রক্ষার বিনিময়ে তার আব্বা তাকে কিছু দেননি, যদিও মিঃ চৌধুরী সেদিন দিলেও কিছু নিতো কিনা সন্দেহ। আজ হঠাৎ যদি কিছু নেবে বলেই এসে থাকে তাতে কোনো দুঃখ নেই...

এমন সময় ফিরে আসে বনহুর, একটু হেসে বলে সে—এই নিন চাবি! ভয় নেই, আপনার আব্বার অর্থ আমি স্পর্শ করিনি।

হুসনা হাত বাড়িয়ে চাবিটা নেয়।

বনহুর বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায় দরজার দিকে।

হুসনা বলে—মিঃ চৌধুরী।

থমকে দাঁড়ায় বনহুর—বলুন?

বনহুর এগিয়ে আসে হুসনার পাশে।

হুসনা বলে—মিঃ চৌধুরী আপনি—আপনি দস্যু বনহুর...

এ কথা আপনার বিশ্বাস হয় না, এই তো?

হাঁ, সত্যি আমি ভাবতে পারি না।

দেখুন, দস্যু বনহুর বলে আপনি আমায় ঘৃণা করবেন না, এই আমার অনুরোধ। আচ্ছা চলি মিস হুসনা।

আর আসবেন না কোনোদিন?

নিশ্চয়ই আসবো।

সত্যি।

হাঁ সত্যি।

বনহুর হুসনার চিবুকে একটু নাড়া দিয়ে বলে—চলি কেমন?

আচ্ছা আসুন।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

হুসনা নির্বাক স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে। মনে পড়তে থাকে সেই কুন্দল দ্বীপে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তার দিনগুলো। কত সুন্দর কত মধুর ছিলো। সেদিন ভাবতে পারেনি মিঃ চৌধুরী একদিন তার চলার পথ থেকে সরে যাবে। সমুদ্রের ধারে বালুচরে ঝিনুক কুড়ানো নিয়ে ছুটোছুটি, সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটা, জাল নিয়ে মাছ ধরা...আজ হুসনার কাছে সব যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে।

হঠাৎ চমকে উঠে হুসনা, তার কানে ভেসে আসে অশ্বপদশব্দ। কান পেতে শুনতে থাকে, শব্দটা ধীরে ধীরে মিশে যায় কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকারে।

আকাশ পরিস্কার হয়ে এসেছে। কুয়াশা কেটে গেছে এখন। ফ্লাইংয়ের জন্য বিমনাখানা রানওয়ে চক্র দিচ্ছে। যাত্রীরা যে যার জায়গায় আসন গ্রহণ করেছে। সবাই নিজ নিজ আসনের সঙ্গে আঁটকানো বেল্ট দিয়ে নিজকে বেঁধে নিয়েছে।

ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ তাদের বুক দুরু দুরু করছিলো, কোন মুহূর্তে দস্যু বনহুর হানা দিয়ে বসবে কে জানে।

বিমানখানা যখন আকাশে উড়লো তখন ফিরোজ রিজভী নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট বের করে যেমন অগ্নিসংযোগ করতে যাবে অমনি পেছন থেকে দু'খানা হাত এগিয়ে এলো—নিন।

ফিরোজ রিজভী চমকে উঠে দেখলো মিঃ আহসান তাঁর পেছনের আসনে বসে তাঁর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করার জন্য ম্যাচ জ্বেলে ধরেছেন।

ফিরোজ রিজভী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আপনি!

হাঁ, আমিও যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে, কারণ আমার একটা কর্তব্য আছে তো!

সত্যি আপনি আসবেন ভাবতে পারিনি।

মিঃ আহসান বললেন—আমাদের কাজ ভাবনার অতীত মিঃ রিজভী।

ফিরোজ রিজভী সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে বসলো। মনে তার আনন্দোচ্ছাস। আহসান সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে ফিরোজ রিজভীর মন।

ফিরোজ রিজভীর সঙ্গীরাও খুশি হয়। মিঃ আহসান তাদের সঙ্গে আছেন এটা যেন এক বিরাট সাহস তাদের।

বিমানখানা এখন আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। হাল্কা হাল্কা মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে বিমানের দু'পাশ দিয়ে। একটু জাম্পিং হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ বিমান বন্দরে পৌঁছবে বিমানখানা।

মিঃ ফিরোজ রিজভী হিন্দল পর্যন্ত না গিয়ে মুর্শিদাবাদ নেমে যাবে, তার সঙ্গীরাও নামবে সেখানে। এখান থেকে চলবে তাদের ব্যবসা।

মিঃ আহসান ওভারকোটের কলারটা চোয়াল পর্যন্ত তুলে দিয়ে নীরবে সিগারেট পান করছিলেন। মাথার ক্যাপটা একটু নীচু হয়ে এসেছে ডান পাশে। পাকা-কাঁচা ফ্রেঞ্চকাটা দাঁড়িগুলো ওভার কোটের ভিতর থেকে উঁকি মারছে যেন। কানের দু'পাশের চুলগুলোও সাদা হয়ে এসেছে। আহসান সাহেবের বয়স তো কম হয়নি, পঞ্চাশের কাছাকাছি। চাকরি থেকে অবসর তাঁর আসন্ন ; মাত্র কয়েক বছর বাকি আছে। মিঃ আহসান সখের গোয়েন্দা নন, পুলিশ বিভাগের নামকরা গোয়েন্দা। এবার তিনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে কর্মময় জীবনকে সার্থক করে তুলতে চান।

আহসান সাহেবের সঙ্গে মিঃ ফিরোজ রিজভীর পরিচয় অল্পদিনের হলেও বেশ ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলো, কারণ মাঝে মাঝে প্রায়ই ফিরোজ রিজভীর

পার্টিতে যোগ দিতে হতো অন্যান্য পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁকে। আজ এই বিপদ মুহূর্তে বন্ধুস্থানীয় পুলিশ গোয়েন্দা আহসান সাহেবকে মস্তবড় একটা সহায়ক মনে হচ্ছে ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের। তিনি যে আসবেন এ কথা জানা ছিলো না তাদের। এমন কি এ ধরনের কোনো আলাপও তারা শুনতে পায়নি কোনো পুলিশ অফিসারের মুখে।

ফিরোজ রিজভী নীরবে বসে ভেবে চলেছে। বিমানখানা এখন কিউকার উপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ বিমান বন্দরের দিকে উড়ে চলেছে। কিউকার দক্ষিণে জম্বু পর্বত এবং জম্বু শহর।

বিমান থেকে জম্বু পর্বতের শৃঙ্গ দেখা যায়।

বিমানখানা এখন মেঘের অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ আহসান পাইলটের পাশে এসে দাঁড়ান, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার চেপে ধরেন তার পিঠে। কঠিন কণ্ঠে বলেন আহসান সাহেব—প্রথমে জম্বু বিমান বন্দরে বিমান নামাতে হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে পাইলট। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা মুর্শিদাবাদ বিমান বন্দরে পৌঁছবে এবং সেখানে তার বিমানখানা অবতরণ করবে। কিন্তু একি হলো, এই লোকটা যে বিমান দস্যু তাতে কোনো সন্দেহ নেই ভেবে নিলো পাইলট।

পিঠে ঠাণ্ডা রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করছে পাইলট, কাজেই তার কোনো প্রতিবাদ করার উপায় ছিলো না।

যাত্রীদের মধ্যে একটা আতঙ্কপূর্ণভাব ফুটে উঠলেও কেউ কোনো কথা বলতে সাহসী হলো না। যে যার নিজ নিজ আসনে বসে সৃষ্টি কর্তার নাম স্মরণ করতে লাগলো।

ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা একটু হকচকিয়ে গেলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি, কারণ মিঃ আহসান তাঁদের কোনো মঙ্গলের জন্যই হয়তো এ কাজ করছেন। তাই তারা নীরবে বসে রইলো।

পাইলট বাধ্য হলো বিমানখানাকে জম্বু এরোড্রাম অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানখানা জম্বু বিমান বন্দরে আকাশে পৌঁছে গেলো মিঃ আহসান পাইলটকে জানালেন জম্বু বিমান বন্দরে জানিয়ে দাও আমাদের বিমানে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় জম্বু বিমান বন্দরে আমাদের বিমান অবতরণ করবে।

পাইলটের পেছনে মৃত্যু বিভীষিকা যমদূত, কাজেই না বলে কোনো উপায় ছিলো না, সে ওয়্যারলেসে জম্বু বিমানবন্দরে জানালো তাদের বিমান অবতরণ করবে।

বিমানখানায় তিনজন পাইলট ছিলো, সবাই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো যেন। বিমানখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান বন্দরে অবতরণ করবে।

নেমে এলেন আহসান সাহেব।

তিনি নামবার পর ফিরোজ-রিজভী এবং তার সঙ্গীদেরকে নেমে আসার জন্য জানালেন। বললেন—কোনো অসুবিধা হবে না। আপনারা কিছুদিন জম্বুতে অবস্থান করে তারপর যাবেন মুর্শিদাবাদ।

বিমান বন্দরে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জম্বু পুলিশপ্রধান মিঃ গওরেস নিসাদী মিঃ আহসানকে অভিনন্দন জানালেন।

কারণ মিঃ নিসাদী আহসান সাহেবের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন।

পাইলটগণ এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে ব্যক্তিকে তারা এতক্ষণ বিমানদস্যু বলে মনে করেছিলো তিনি বিমান দস্যু নন, তিনি একজন দক্ষ পুলিশ গোয়েন্দা। বিশেষ কারণে জম্বু অবতরণের প্রয়োজন ছিলো বলেই বিমানখানাকে কৌশলে নামানো হয়েছে।

জম্বু বিমান বন্দরের বাইরে একটা বড় জীপগাড়ি অপেক্ষা করছিলো। মিঃ আহসান, ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা এগুতেই এক জন পুলিশ ড্রাইভার এসে আহসান সাহেবকে সেলুট করে বললো—স্যার, গাড়ি অপেক্ষা করছে।

আহসান সাহেব ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের জীপে উঠে বসার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশের আসনে উঠে বসলেন।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

জম্বু পাহাড়িয়া অঞ্চল, কাজেই পথঘাট সব পাথুরিয়া। গাড়ি খানা এগিয়ে যাচ্ছে। জম্বু শহরখানা কতকটা ছবির মত সুন্দর। পাহাড়ের পাদদেশে এ শহর।

গাড়ির দু'পাশ দিয়ে পদব্রজে এগিয়ে চলেছে অগণিত জম্বুবাসী। এরা দেখতে কতকটা নেপালিদের মত। পোশাক পরিচ্ছদও পরে এরা নেপালীদের ধরনের।

এরা যানবাহনে বেশি চড়ে না, পায়ে হেঁটেই এখান থেকে সেখানে যাওয়া আসা করে বেশি। সব সময় এরা কাজ নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত থাকে। মিঃ ফিরোজ রিজভী আর-তার সহকারীরা গাড়ির বাইরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মনে তাদের নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে। মিঃ আহসান তাদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই এমন কোনো স্থানে দস্যু বনহুর যেখানে কোনোদিন তাদের সন্ধান পাবে না। তারা যেখানেই থাকুক না কেন কৌশলে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাবে।

ফিরোজ রিজভীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, গাড়িখানা জম্বু শহরের পথ ছেড়ে এবার পাহাড়িয়া পথ ধরে সোজা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। খাড়া পথ যেন সোজা পাহাড়ের গায়ে চলেছে। একপাশে উঁচু নীচু পাথরের স্তূপ অন্য পাশে খাড়া পাহাড়।

ফিরোজ রিজভী বললো এবার—আহসান সাহেব আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মিঃ আহসান বললো—নিরাপদ স্থানে।

মিঃ ফিরোজ রিজভী আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহসী হলো না। মিঃ আহসান এমনি তাদের জন্য যথেষ্ঠ করলেন। তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে এসেছেন তিনি তাদের রক্ষক হিসেবে।

এখন গাড়িখানা সম্পূর্ণ নির্জন পথ অতিক্রম করে চলেছে। দু'পাশে খাড়া পাহাড় মাঝখান দিয়ে সোজা সরু পথ। পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে বেশ কিছু এগুনোর পর এবার যেন নিচের দিকে নেমে গেছে বলে মনে হলো।

জীপ গাড়িখানা এখন সম্পূর্ণ নিচে নেমে যাচ্ছে।

রিজভী ও তার সঙ্গীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। গাড়িখানা প্রবেশ করলো একটা সুড়ঙ্গপথে। দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গপথটা।

ফিরোজ রিজভী বললো—এ সুড়ঙ্গপথের নাম কি মিঃ আহসান?

নাম জেনে কি হবে বলুন? এখানে যে আসে তাকে কেউ কোনোদিন খুঁজে পায় না।

মিঃ আহসানের কথাগুলো যেন কেমন হেঁয়ালিপূর্ণ বলে মনে হলো ফিরোজ রিজভীর কাছে। তার সঙ্গীরা এ মধ্যে এ ওর কানে মুখ নিয়ে কিছু বলা-কওয়া করলো।

একজন চাপাকণ্ঠে বললো—আহসান সাহেব কি আমাদের সত্য সত্য নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন, না...

হেসে বললো মিঃ আহসান—পৌঁছেই বুঝতে পারবেন নিরাপদ স্থানে যাচ্ছেন আপনারা।

কিছু সময়ের মধ্যেই একটা গুপ্তগুহার মুখে এসে গাড়ি থামলো।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন আহসান সাহেব। তিনি নেমে ফিরোজ রিজভী ও তার সংগীদের নামার জন্য বললেন।

ফিরোজ রিজভী ও তার সংগীরা নেমে দাঁড়ালো।

পুলিশ ড্রাইভার এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, সে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেললো।

গুপ্ত গুহা থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন পুলিশ। সেলুট জানালো মিঃ আহসান।

এতক্ষণে মিঃ রিজভী ও তার সঙ্গীদের মনে একটু সাহস সঞ্চারিত হলো। যা হোক পুলিশের লোকজন দেখে মনটা তাদের আস্বস্ত হলো কিছুটা।

মিঃ আহ্সান কোনো কথা না বলে এগুলেন যে পথে দু'জন পুলিশ বেরিয়ে এসেছিলো সেই পথে।

পুলিশ দু'জন ফিরে মিঃ রিজভী এবং তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো—আসুন।

পুলিশদ্বয়কে অনুসরণ করলো ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা।

বেশ কিছুটা চলার পর একটা সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হলো পুলিশদ্বয়। ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের মনে আতঙ্ক জাগলো, তারা এদিক ওদিক তাঁকাতে তাকাতে পথ চলেছেন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে তাদের মুখে।

মিঃ আহ্সান তাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই চলে গেলেন, কোথায় গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা প্রশস্ত গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালো পুলিশদ্বয়।

ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো গুহাটার মধ্যে কোনো আসবাবপত্র নেই, শুধু কয়েকটা আসন।

আসনগুলো লোহার তৈরি।

পুলিশদ্বয় বললো আপনারা এখানে বসুন এবং বিশ্রাম করুন।

ফিরোজ রিজভী বললো—মিঃ আহ্সান কোথায়?

তিনি তাঁর বিশ্রামকক্ষে গেছেন, আপনারা সময়মত তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবেন।

পুলিশদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

ফিরোজ রিজভী বললো—জানি না মিঃ আহ্সান আমাদের কোথায় নিয়ে এলেন।

ফিরোজ রিজভীর সঙ্গীদের মধ্যে মীর ইউনুস, হুসাইন মিয়া, হায়দার আলী এই তিনজন এসেছিলো। এরা কিছুটা ভড়কে গেলেও তবু মনে তাদের ভরসা, যা হোক দস্যু বনহুরের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এটাই তাদের জীবনের সার্থকতা।

ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা যখন জম্বু পর্বতের একটা গুপ্তগুহায় বসে নানারকম চিন্তা করে চলেছে, তখন কান্দাই শহরে পুলিশবাহিনী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার নিয়ে ফিরোজ রিজভীর বাড়ির চারপাশে বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন।

এক সময় রাত ভোর হয়ে আসে।

পুলিশবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। যদিও তারা সমস্ত রাত বিরাট আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে এসেছে। এক্ষণে তারা ক্লান্ত অবসন্ন।

মিঃ জাফরী ও তার অন্যান্য পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসে বসে নানারকম আলাপ-আলোচনা করছিলেন। মূল কথা হলো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের এবার প্রথম প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেলো।

মিঃ জাফরী ভীষণভাবে গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছেন। সবাই ফিরে এসেছেন কিন্তু মিঃ আহসান এখনও ফিরে আসেননি! তিনি গেলেন কোথায়?

মিঃ জাফরী মিঃ জায়েদীকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি মিঃ আহসান সম্বন্ধে কতটুকু জানেন মিঃ জায়েদী?

মিঃ জায়েদী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধুঁয়া ত্যাগ করে বললেন—মিঃ আহসান সাহেবের সঙ্গে চারটা পর্যন্ত আমার যোগাযোগ ছিলো, তারপর আমি তার কোনো খোঁজ পাইনি।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ আহসানের সঙ্গে যে পুলিশবাহিনী কার্যরত ছিলো তারা কিছু জানায় নি?

বললেন জায়েদী—হাঁ, তারা জানিয়েছে কিন্তু তাদের কথায় সঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। মিঃ নূর ইসলাম, মিঃ মোহসিন ও ছিলেন তাদের কাছে, আপনি বিস্তারিত তাদের কাছে জানতে পারেন।

মিঃ জাফরীর নির্দেশে মিঃ নূর ইসলাম ও মিঃ মোহসিনকে সেখানে ডেকে পাঠানো হলো। তাঁরা পুলিশ অফিসে এসে দেখলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদী মুখ কালো করে বসে আছেন।

মিঃ নূর ইসলাম ও মিঃ মোহসিন আদাব জানালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—বসুন।

উভয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ জায়েদী বললেন—গত রাতে মিঃ আহসান সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আপনারা—বলুন মিঃ জাফরী শুনতে ইচ্ছুক।

হাঁ মিঃ নূর ইসলাম, মিঃ আহসান সম্বন্ধে কতটুকু জানেন জানতে চাই? বললেন মিঃ জাফরী।

নূর ইসলাম একটু ভেবে নিয়ে বললেন—স্যার, গত রাতে আমি এবং মিঃ মোহসিন আহসান সাহেবের পাশেই ছিলাম। আমাদের সঙ্গে বিশজন পুলিশ ছিলো। আমরা যখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফিরোজ রিজভীর বাড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতীক্ষা করেছিলাম তখন কোনো এক গীর্জা থেকে ঘন্টাধ্বনি হলো। স্যার, মিঃ আহসান তখন বললেন আমি আসছি আপনারা ভালভাবে ওদিকে খেয়াল রাখবেন। মিঃ আহসান বিলম্ব না করে চলে গেলেন। কেন গেলেন এবং কোথায় গেলেন জানি না।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে আসে মিঃ জাফরীর, তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—মিঃ আহসান চলে গেলেন তারপর আর ফিরে এলেন না অথচ আপনারা তার কোনো খোঁজখবর না করে নীরব রইলেন?

স্যার, আমরা মনে করেছিলাম এই বুঝি আসবেন। কিন্তু প্রতীক্ষা করতে করতে রাত ভোর হয়ে এলো অথচ মিঃ আহসান সাহেব আসেন না।

আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছেন?

প্রায় দু'ঘন্টা।

ভোর ছয়টা পর্যন্ত?

হাঁ স্যার।

আপনি পুলিশ অফিসে এ সংবাদ দেননি কেন?

ভেবেছিলাম তিনি বৃদ্ধ মানুষ, দারুণ শীতের কষ্ট সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তাই হয়তো তিনি বাসায় চলে গেছেন।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন—হু।

মিঃ জায়েদী বললেন—ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী বললেন—তারপর কখন আপনারা বাসায় খোঁজ নিয়ে জানলেন তিনি বাসায় যাননি?

এবার মিঃ মোহসিন জবাব দিলেন—আমরা অফিসে গিয়েই ফোন করে জানতে পারি তিনি বাসায় যাননি।

মিঃ জাফরী বললেন—বাড়ি থেকে কে জানালো তিনি যাননি?

তাঁর কন্যা হুসনা।

কি বলেছিলো সে ফোনে?

বলেছিলো—আব্বা বাসায় আসেননি, তিনি কোথায় আমরা জানার জন্য ব্যস্ত আছি।

মিঃ জায়েদী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—মিস হুসনা তারপর থেকে বার বার ফোন করে জানতে চাইছে তার আব্বা কোথায় এবং এতক্ষণ তিনি বাসায় ফিরে যাচ্ছেন না কেন?

মিঃ জাফরী বললেন—আপনারা তাকে কি জবাব দিয়েছেন?

মিঃ জায়েদী বললেন—নূর ইসলাম বলেছেন তিনি পুলিশ অফিসে ফিরে পুনরায় বাইরে কাজে গেছেন।

মিঃ জাফরী বললেন—কিন্তু কতক্ষণ এভাবে মিথ্যা বললেন আপনারা?

নূর ইসলাম বললেন—স্যার, কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না।

মিঃ মোহসিন বললেন—মিস হুসনা এবং তার মা অত্যন্ত ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—কেন আহসান সাহেব এতক্ষণ বাসায় যাচ্ছেন না।

তা তো নিশ্চয়ই। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে এনে তিনি যদি অকস্মাৎ নিখোঁজ হন তাহলে ভাবনার কথাই বটে। ব্যাপারটা যেন বাইরে না ছড়ায় এদিকে হুশিয়ার থাকবেন।

কথাগুলো বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ জায়েদ তার নিঃশেষিত সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন চেপে রাখলেও কতক্ষণ চেপে যাবেন? কথাটা প্রকাশ পাবেই। দেখুন সত্য ঘটনাটা মিঃ আহসান এর স্ত্রী-কন্যাকে জানানো দরকার।

ঠিক এ মুহূর্তে ফোন বেজে উঠলো।

মিঃ জাফরী রিসিভার হাতে তুলে নিলেন—হ্যালো—

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ—হ্যালো, আমি হুসনা বলছি—বলুন আমার আব্বা পুলিশ অফিসে ফিরে এসেছেন কি?

মিঃ জাফরী বললেন, তিনি এখনও আসেননি—এলেই তিনি বাসায় যাবেন—ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই—

পুনরায় হুসনার গলার আওয়াজ—দেখুন আব্বার জন্য আমরা অত্যন্ত চিন্তান্বিত আছি—তাঁর তো কোনা বিপদ ঘটেনি।

এবার চট্ করে জবাব দিতে পারেন না মিঃ জাফরী, তিনি আবার আমতা আমতা করে বলেন—বিপদ না না বিপদ ঘটেনি তবে তিনি কাউকে কিছু না বলে বাইরে গেছেন—আমরা ঠিক বলতে পারছি না তিনি কোথায় গেছেন এই যা—

হুসনার কণ্ঠ আব্বা তাহলে কোথায় গেছেন, কেন গেছেন, আপনারা জানেন না?

—না মা, আমরা ঠিক জানি না, তবে তিনি যেখানেই যাননা কেন, ভাল আছেন—

হুসনা বলে—আমরা কিন্তু আব্বার জন্য একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না—আব্বু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে গেছেন আমরা এটুকু জানি এখন বেলা দশটা বাজে তবু আব্বা ফিরে এলেন না কেন জানি না—

এলেই তাঁকে বাসায় পাঠিয়ে দেবো কিছু ভেবো না মা হুসনা—হ্যালো—হুসনা—

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হুসনার—বলুন।

তোমার আম্মা কেমন আছেন?

তিনি আব্বার চিন্তায় বেশি অস্থির হয়ে পড়েছেন—তাঁকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছি না—

মিঃ জাফরী বললেন—এত বেশি ভাবনার কি আছে—মিঃ আহসান প্রখ্যাত পুলিশ গোয়েন্দা, তিনি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ—নিশ্চয়ই এমন কোনো কাজে লিপ্ত আছেন যা আমরা কেউ জানি না—আচ্ছা এখন রাখি, কেমন?

রাখুন—হুসনা ওপাশে রিসিভার রাখলো।

মিঃ জাফরী হুসনাকে যতই সান্ত্বনা দিননা কেন তার মনেও বিরাট একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছিলো, হঠাৎ মিঃ আহসানের উধাও ব্যাপারটা কেমন যেন বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

শুধু তিনি নন সমস্ত পুলিশ বিভাগ এ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন—মিঃ আহসান গেলেন কোথায়।

❑

দু'দিন দু'রাত কেটে গেছে আজও ফিরে আসেননি মিঃ আহসান। কথাটা যতই চেপে রাখতে চান না কেন, কিছুতেই চাপা রইলো না, শহরময় ছড়িয়ে পড়লো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে গিয়ে মিঃ আহসান নিজেই উধাও হয়ে গেছেন।

পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বিরাট একটা উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছে তিনি নিজে গেলেন অথচ ফিরে এলেন না। তাকে কেউ তো ধরে নিয়ে যায়নি বা কেউকেও নিয়ে যায়নি। হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন।

তাঁর বাসায় স্ত্রী এবং কন্যা হুসনা কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়েছে।

আত্মীয়স্বজন কান্দাইয়ে তাদের তেমন কেউ ছিলো না তবু সংবাদ পেয়ে দু'এক জন বন্ধু স্থানীয় যারা ছিলেন তাঁরা এসে পড়লেন। নানাভাবে মিসেস আহসান এবং হুসনাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

গভীর রাত।

হুসনার মনে দারুণ চিন্তা, তার আব্বার হঠাৎ অন্তর্ধান তাদের সবাইকে একেবারে মুষড়ে ফেলেছে।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন, তারা মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ি ঘেরাও করে পাহারা দিয়েছিলেন। তাঁদের সবাই ফিরে এসেছেন, শুধু ফিরে আসেননি তার আব্বা। তবে কি দস্যু বনহুর তার আব্বাকে হত্যা করে ফেলেছে? অসম্ভব কিছু নয়, কারণ দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সে যতটুকু শুনেছে তাতে দস্যু বনহুর নরপিচাশের চেয়েও ভয়ঙ্কর এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কি করে তা সম্ভব? মিঃ চৌধুরী কিছুতেই এমন হৃদয়হীন হতে পারে না। মিঃ চৌধুরী যে দস্যু বনহুর, একথা সে আজও ভাবতে পারে না, ভাবতে পারে না তার আব্বার কোনো ক্ষতি সে করতে পারে। হঠাৎ হুসনার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, চমকে উঠে সে তার আব্বার ঘরে টেলিফোনটা একটানা বেজে চলেছে।

হুসনা কান পেতে শুনে তার আব্বার ঘরে টেলিফোন বাজছে না তার কানের ভুল। না সত্যিই। এবার হুসনা শয্যা ত্যাগ করে তার আব্বার ঘরে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নেয় হাতে—হ্যালো।

ওপাশ থেকে ভেসে আসে পুরুষকণ্ঠ—কে হুসনা? আমি তোমার আব্বা কথা বলছি।

হুসনা বলে উঠে—আব্বা তুমি...তুমি কোথা থেকে কথা বলছো?

...মা হুসনা, আমি যেখানেই থাকি ভাল আছি আমার জন্য কিছু ভেবো না—

হুসনা কিছু বলতে গেলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো। হুসনা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো... কিন্তু কোনো জবাব এলো না।

হুসনার মুখমন্ডল কালো হয়ে উঠলো, সে রিসিভার রেখে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করলো।

মিসেস আহসান স্বামীর জন্য ভেবে ভেবে এতক্ষণে হয়তো একটু ঘুমিয়েছেন। হুসনা মাকে না জাগিয়ে ফিরে এলো নিজের কক্ষে। ভাবতে লাগলো হুসনা কথাটা কি রাতেই মিঃ জাফরীকে জানাবে না কাল ভোরে।

রাতে সে আর কাউকে কিছু বললো না, নিজের মনেই চিন্তা করতে লাগলো। তার আব্বা হঠাৎ গভীর রাতে কোথা থেকে টেলিফোন করলেন, তিনি ভাল আছেন শুধু এটুকু জানালেন, এর বেশি একটা কথাও বললেন না। কোথা থেকে তিনি টেলিফোন করছেন বা কোথায় আছেন কিছু জানালেন না। হঠাৎ এমনভাবে রিসিভার রেখে দেবার কারণ কি...

হুসনার সমস্ত রাত ঘুম হলো না,. সে এসব নিয়ে অবিরত ভেবে চললো।

ভোরে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে গতরাতের ঘটনাটা মায়ের কাছে ব্যক্ত করলো হুসনা।

মিসেস আহসান শুনে বললেন—সত্যি সত্যি নিজে বলেছেন আমি ভাল আছি?

হাঁ আম্মা, আব্বা নিজে বললেন—আমি যেখানেই থাকি ভাল আছি, আমার জন্য কিছু ভেবো না।

মিসেস আহসান যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

যা হোক, তিনি যেখানেই থাক ভাল আছেন জীবিত আছেন এটাই সবচেয়ে সান্ত্বনার কথা।

হুসনা এ ব্যাপারটা পুলিশ অফিসে জানাতে চেয়েছিলো কিন্তু কিছু মনে করে সে এ কথা চেপে গেলো, কারণ তার আব্বা এ কথা কাউকে জানাতে বলেননি।

❑

রিজভী ও তাঁর দলবল নিশ্চিন্ত মনে দু'দিন কাটিয়ে দিলো। তাদের কোনো অসুবিধাই হলো না এখানে। দু'জন পুলিশ সদাসর্বদা তাদের পাশে হাজির থাকে খোঁজখবর নিয়ে চললো।

কিন্তু তারা অবাক হয়েছে, কারণ মিঃ আহসান তাদের এখানে নিয়ে আসার পর আর একটাবারও তাদের পাশে আসেননি।

ফিরোজ রিজভী জিজ্ঞাসা করলে পুলিশরা জবাব দিয়েছিলো— মিঃ আহসান কাজে ব্যস্ত আছেন। এর বেশি আর কোনো কথাই তারা জানতে পারেনি।

ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীদের জন্য যে গুহাটা দেওয়া হয়েছিলো সে গুহাটার মধ্যে ছিলো দুটো বিছানা এবং কয়েকটা বালিশ। যদিও বালিশগুলো একেবারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয় তবু অসময়ে ধনকুবের মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীদের বড় উপকারে লাগলো।

ওরা খায় দায় ঘুমায়, ভাবে ব্যবসার কথা। ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে এসেছে ক'জন আর কান্দাই শহরে আত্মগোপন করে রয়ে গেছে কয়েকজন। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ব্যবসা চালু রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিরোজ রিজভী জানে তার অবর্তমানে তাদের ব্যবসা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। বাড়ি থেকে বিদায় মুহূর্তে তার পার্টনারদের সঙ্গে এসব নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছে। তবু স্বস্তি পাচ্ছে না ফিরোজ রিজভী। রাতে শুয়ে তার চোখে ঘুম আসে না, কবে কখন কোন্ মাল কোথায় চালান গেছে, কবে কোন্ মাল কোথায় আসার কথা আছে সব সময় এসব চিন্তা তার মাথার মধ্যে কিলবিল করে চলেছে।

যখন তখনই সঙ্গীদের সঙ্গে এসব নিয়ে সলা-পরামর্শ করে রিজভী। যদিও সঙ্গীদের তরফ থেকে খুব একটা উৎসাহ পায় না সে, তবু হতাশ হয় না।

সেদিন বসে বসে ব্যবসা নিয়েই চাপাভাবে আলাপ-আলোচনা চলছিলো ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে, এমন সময় মিঃ আহসান এসে হাজির হলেন। একটু হেসে বললেন—আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

আহসান সাহেবকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো ফিরোজ রিজভী এবং তার সঙ্গীরা। আদাব জানালো তারা আহসান সাহেবকে।

মিঃ আহসান আসন গ্রহণ করে বললেন—আমি দুঃখিত, এ ক'দিন আপনাদের কোনো খোঁজখবর নিতে পারিনি।

ফিরোজ রিজভী বললো—আপনার মেহেরবানিতে আমার ভাল আছি এবং আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শুনে খুশি হলাম।

ফিরোজ রিজভী বলে উঠে—আপনার দয়ার কথা কোনোদিনই ভুলবো না মিঃ আহসান। আপনি মেহেরবানি করে সেদিন যদি আমাদের মাঝপথে না সরিয়ে নিতেন তাহলে হয়তো হিন্দেল গিয়েও দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা পেতাম না।

মিঃ আহসান সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন রিজভীও তার সঙ্গীদের সম্মুখে—নিন।

রিজভী একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললো—ধন্যবাদ।

তার সঙ্গীরাও এক একটা সিগারেট তুলে নিলো হাতে।

মিঃ আহসান সবশেষে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে গুঁজলেন ঠোঁটের মধ্যে। তারপর রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব।

মিঃ আহসান কয়েকমুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন—মিঃ রিজভী, শুধু দস্যু বনহুরের হাত থেকে আপনাদের রক্ষার জন্য আমার প্রচেষ্টা নয়, আমার উদ্দেশ্য আপনাদের ব্যবসাকেও রক্ষা করা।

মিঃ আহসানের মুখে তাদের ব্যবসার নাম উচ্চারণ করতে শুনে ফিরোজ রিজভীর চোখ দুটো আনন্দীত হয়ে উঠে। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে বললো সে—মিঃ আহসান, আপনি আমাদের ব্যবসাকে রক্ষা করতে চান?

কেন, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না আপনাদের?

না না, বিশ্বাস হবে না কেন। আপনি আমাদের জীবনরক্ষক আর আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো না—কি যে বলেন! আহসান সাহেব, আপনি আমাদের ব্যবসা সম্বন্ধে...

হাঁ, আপনাদের ব্যবসা সম্বন্ধে সব জানতে চাই এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে চাই। মিঃ রিজভী, চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করা আজকাল দুরুহ ব্যাপার, কাজেই...একটু থেমে বললেন আহসান সাহেব পুনরায়—কাজেই চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবো মনস্থির করে নিয়েছি।

সত্যি। সত্যি বলছেন মিঃ আহ্সান?

হাঁ সত্যি। আপনাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুটিনাটি সবকিছু আমাকে জানালে আমি খুশি হবো এবং আপনাদের সঙ্গে পার্টনার হিসেবে কাজ করবো।

ফিরোজ রিজভী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। যা হোক মিঃ আহসানকে পার্টনার হিসেবে পেলে তার ব্যবসার কোনোই অসুবিধা থাকবে না আর। ফিরোজ রিজভী মনে মনে খুশি হলো, বললো সে—আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র সব সঙ্গে এনেছি, আপনাকে পার্টনার করে নিতে কোনোই অসুবিধা হবে না মিঃ আহসান।

বেশ, আমি রাজি। এবার কাগজপত্রগুলো সব আমাকে দেখান এবং বুঝিয়ে বলুন। আপনার সঙ্গে যখন কারবার করবো তখন সবকিছু জানা দরকার।

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আসুন আমরা কাগজপত্র নিয়ে বসি।

ফিরোজ রিজভী এবং মিঃ আহসান কাগজপত্র নিয়ে বসলেন। ঘন্টা তিন-চার ধরে কাগজপত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা চললো।

ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে মিঃ আহসান ব্যবসা করবেন, কাজেই কোনো কিছু গোপন করার ছিলো না। কান্দাই শহরে কোথায় কোন্ গোপন ব্যবসাকেন্দ্র আছে, কোথায় কে কে তাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছে, কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে তারা কারবার করে এবং কোন্ ব্যাঙ্কের কত টাকা মজুত আছে সব নিয়েই আলোচনা হলো তাদের মধ্যে।

মিঃ আহসান বললেন—মিঃ রিজভী, আপনি এখানে এই জম্বুতে থাকবেন আর আমি আপনার হয়ে কান্দাই শহরে আপনার ব্যবসা চালিয়ে যাবো। তবে হাঁ, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই আমি কাজ করবো।

রিজভী খুশি হলো এবং মিঃ আহসানের সঙ্গে হাতে হাত মিলালো।

রিজভী যা চাচ্ছিলো তাই হলো। সে যেখানেই থাক না কেন, তার ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আহসান সাহেবকে পার্টনার হিসেবে পেয়ে তাঁর মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। মিঃ আহসানের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো রিজভী—আপনি সহায়তা করলে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

অকস্মাৎ হেসে উঠলেন মিঃ আহসান।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীরা।

মিঃ আহসান বললেন—আমিও কম কৃতজ্ঞ নই, আপনারা আমাকে আপনাদের ব্যবসায় অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ান মিঃ আহসান—আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবো।

বেরিয়ে যান আহসান সাহেব।

টেবিলে ফোনটা সশব্দে বেজে উঠলো।

মিঃ জাফরী রিসিভারটা তুলে নিলেন হাতে—হ্যালো স্পিকিং জাফরী—

ওপাশ থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর...গুড নাইট মিঃ জাফরী...বন্ধু, আপনাকে কত করে বললাম আমার পিছু ত্যাগ করুন...আমাকে ঠিকমত কাজ করতে দিন......কিন্তু আপনি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মিঃ জাফরীর ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠলো...কে...আপনি কে কথা বলছেন।

আমি দস্যু বনহুর বলছি...

দস্যু বনহুর। ...

হাঁ বন্ধু...

মিঃ জাফরীর মুখমন্ডল রাগে-ক্ষোভে রাঙা হয়ে উঠলো, তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—তোমার কণ্ঠস্বরই আমাকে বলে দিয়েছে তুমি কে—

—তবু জানবার ইচ্ছা হয়েছিলো, তাই নয় কি বন্ধু? হ্যালো, দেখুন পুনরায় অনুরোধ করছি, আমার পথে আপনারা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, কারণ কোনো বাধাই আমার চলার পথ রোধ করতে পারবে না...

মিঃ জাফরী দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তুমি অন্যায় করে চলবে আর আমরা তোমাকে সহায়তা করবো।

—আপনাদের সহায়তা আমার কাম্য নয় মিঃ জাফরী, আপনারা শুধু আমার কাজে বাধা দেবেন না, এইটুকুই আমার অনুরোধ। হ্যালো মিঃ জাফরী...আজ কেন এই রাত দুপুরে আপনাকে বিরক্ত করছি হয়তো অনুমান করেছেন—শুনুন, আপনারা শুধু আমার কাজেই বাধা দিয়ে যাচ্ছেন তাই নয়—দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করে চলেছেন আপনারা—

—বনহুর, দিন দিন তুমি চরম সাহসী হয়ে উঠেছে—আমরা দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করে চলেছি এ কথা বলতে পারলে আমি তোমাকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত—

মিঃ জাফরীর কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর...বিশ্রাম করবেন না এই তো...তাহলে আমার পথ থেকে সরেও দাড়াবেন না...আমার এ অনুরোধ ব্যর্থ হলো...মিঃ জাফরী, মনে রাখবেন দুষ্কৃতিকারীদের সহায়তা করার অপরাধে আপনারাও অপরাধী। বলুন মিঃ আহসান কোথায়? জানি এ জবাব আপনারা দিতে পারবেন না, কারণ আপনারা জানেন না তিনি কোথায়—শুনুন মিঃ জাফরী, প্রখ্যাত পুলিশ গোয়েন্দা মিঃ আহসান কোথায় আছেন এবং কি করছেন আপনারা না জানলেও আমি জানি...তিনি আত্মগোপন করে ফিরোজ রিজভীর ব্যবসায় সহযোগিতা করে চলেছেন।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী...কি বললে, মিঃ আহসান কোথায় আছে তুমি জানো তিনি ফিরোজ রিজভীর ব্যবসায় সহযোগিতা করে চলছেন...

...শুধু তিনি নন, আপনারা সবাই তাকে সহযোগিতা করে চলেছেন মিঃ জাফরী...কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি এখনও দুষ্কৃতিকারীদের সহায়তা থেকে বিরত থাকুন।

মিঃ জাফরী কোনো জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার পূর্বেই ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো। রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলেন মিঃ জাফরী। তিনি রিসিভার রেখে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন। দস্যু বনহুরের এত সাহস তার কাছে টেলিফোন করে।

হঠাৎ ফোনটা পুনরায় বেজে উঠে ক্রিং ক্রিং শব্দে। মিঃ জাফরী এগিয়ে গিয়ে কঠিন হস্তে রিসিভার তুললেন—হ্যালো...

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে আসে—মিঃ জাফরী, সমস্ত কান্দাই শহরের যে পুলিশ বাহিনী ছড়িয়ে রেখেছেন, শীঘ্র তাদের সরিয়ে নিন...মনে রাখবেন এ আমার অনুরোধ নয়—আমার আদেশ...

মিঃ জাফরী কোনো জবাব দেবার পূর্বেই ওপাশে ফোন ছেড়ে দেয়। মিঃ জাফরী রাগে গসগস করে ওঠেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করেন তিনি। মিঃ ইয়াসিন তখন পুলিশ অফিস ইন্‌চার্জ ছিলেন। তিনি ফোন ধরতেই অবাক হলেন মিঃ জাফরী, জানালেন এই মাত্র দস্যু বনহুর তাঁকে ফোন করছিলো তারা যেন তার পিছু ত্যাগ করে এবং শহরময় যে পুলিশ বাহিনী ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তা উঠিয়ে নেয়। এত সাহস দস্যু বনহুরের সে আর কোথায়ও ফোন না করে সোজা মিঃ জাফরীর কাছে ফোন করছে। মিঃ জাফরী মিঃ ইয়াসিনকে নির্দেশ দিলেন যেন পুলিশ বাহিনী আরও জোরদার করা হয়। সমস্ত শহরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

মিঃ ইয়াসিন জানালেন, আমরা ঠিকমতই শহরের সমস্ত জায়গায় সজাগ পুলিশ মোতায়েন রেখেছি, দস্যু বনহুরের সাধ্য নেই সে শহরবাসীর কোনো ক্ষতি সাধন করে।

মিঃ ইয়াসিনের জবাবে মিঃ জাফরী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দস্যু বনহুরের উপদ্রব কিছুদিন বন্ধ ছিলো, পুনরায় তার আবির্ভাবে কান্দাইবাসী আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। শুধু কান্দাইবাসী নয়, কান্দাই পুলিশ বাহিনীর শান্তি-সুখ বিলুপ্ত হয়েছে।

মিঃ ইয়াসিন রিসিভার রেখে ফিরে দাঁড়াতেই একটা ছায়ামূর্তি তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালো। দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রিভলবার।

মিঃ ইয়াসিন চমকে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার খুলে রিভলবার বের করতে গেলেন কিন্তু তার পূর্বেই বলে উঠে ছায়ামূর্তি খবরদার ড্রয়ারে হাত দেবেন না।

কে তুমি?

চিনতে পারেননি?

তুমি দস্যু বনহুর?

এইতো চিনতে পেরেছেন।

কি চাও তুমি?

চাই আপনার সহায়তা।

সহায়তা?

হাঁ।

মিঃ ইয়াসিন দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

বনহুর হেসে বললো—কেউ আসবে না, কারণ পাহারারত পুলিশরা নিদ্রায় অচেতন।

মিঃ ইয়াসিনের চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠে।

বনহুর বলে—দোষ ওদের নয়, আমি ওদের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

মিঃ ইয়াসিন বলে উঠেন—তুমি নাকি এই মুহূর্তে মিঃ জাফরীর বাসায় ফোন করেছিলে? তবে কি তিনি ভুল বলেছেন?

না, ভুল তিনি বলেননি। আমি আপনাদের এক নম্বর অফিস রুম থেকে কয়েক মিনিট পূর্বে মিঃ জাফরীর কাছে টেলিফোন করেছিলাম।

আশ্চর্য—

মোটেই আশ্চর্য নয়। যাক আপনার যখন আমার অনুরোধ শুনবেন না। আমি চৌধুরীবাড়ি যাবো কিন্তু আপনাদের নির্দেশে চৌধুরীবাড়ির চারিদিকে অসংখ্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশবাহিনী কড়া পাহারা দিচ্ছে অথচ আমার না গেলেই নয়...

মিঃ ইয়াসিনের চোখ দুটো জ্বলছে যেন, এই মুহূর্তে বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে এক লাখ নয় দু লাখ টাকা...কিন্তু দস্যু বনহুরকে কি করে তিনি গ্রেপ্তার করবেন এবং এই টাকা লাভ করবেন।

বনহুর নিজের মুখের আবরণ খুলে ফেলে, তারপর আরও সরে আসে—দেখুন মিঃ ইয়াসিন, আমার মা অসুস্থ, একবার চৌধুরীবাড়ি যেতেই হবে আমাকে।

মিঃ ইয়াসিন অবাক হয়ে দেখছিলেন দস্যু বনহুরকে। এতদিন তিনি দস্যু বনহুরের নামই শুনে এসেছেন কিন্তু তাকে এভাবে একেবারে চাক্ষুষ দেখেননি।

মিঃ ইয়াসিনকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে—কি দেখছেন?

তোমাকে।

আমাকে?

হাঁ। সত্যি সুপুরুষ বটে। তোমার পৌরুষদীপ্ত সুন্দর চেহারা সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সেই সুযোগ নিয়ে তুমি তরুণীদের মন জয় করে নাও—

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন মিঃ ইয়াসিন?

তুমি শত শত মেয়ের সর্বনাশ করোনি?

মিঃ ইয়াসিন!

সত্য কথা বলছি, রাগ করছো কেন? মিঃ আহসানের কন্যা মিস হুসনার সর্বনাশ তুমি করোনি? সর্বনাশ করেছো বলেই সে আজ—

বলুন সে আজ কি?

মিঃ চৌধুরী বলতে লাগল। আমরা তোমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে সে কিছুতেই সঠিক জবাব দেয় না—

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—মিঃ ইয়াসিন, এই মুহূর্তে আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম, বেশিক্ষণ আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আমার নেই। আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

চৌধুরীবাড়ি যাবো, আপনি আমায় সহায়তা করবেন।

কি করতে হবে বলো?

আপনার ড্রাইভারকে বলে দিন গাড়ি প্রস্তুত করতে এবং আপনার যে কোনো একজন পুলিশের ড্রেসে আমাকে চৌধুরীবাড়ি নিয়ে চলুন, মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। কিন্তু সাবধান, যদি কোনো রকম চালাকি

করতে যান তাহলে প্রাণ হারাবেন। কথাগুলো বলার সময় বনহুর তার হস্তস্থিত রিভলভারখানা চেপে ধরলো মিঃ ইয়াসিনের বুকে।

মিঃ ইয়াসিন ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—না, আমি কোনো রকম চালাকি করবো না।

সত্যি তো?

প্রাণের মায়া আমারও আছে।

ধন্যবাদ।

বনহুর চলে যায় এবং একটু পর সে ফিরে আসলো। তখন হাওলদার শের আলীর ড্রেসে সজ্জিত। হঠাৎ তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না।

মিঃ ইয়াসিনও চিনতে পারলেন না, তিনি বললেন—শের আলী, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—শের আলী ঘুমাচ্ছে, চলুন—

দস্যু বনহুর!

না, আপনার বন্ধু।

চলো তবে।

দেখুন পুনরায় সাবধান করে দিচ্ছি যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে নেবেন না। আপনি চৌধুরীবাড়িতে কোনো কারণে যাচ্ছেন, এবং গিয়ে কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করবেন, আমি মাকে দেখে ফিরে আসবো।

বেশ চলো।

শের আলীবেশী দস্যু বনহুর সহ মিঃ ইয়াসিন বেরিয়ে এলেন পুলিশ অফিসের বাইরে।

পুলিশ অফিসের সম্মুখে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

মিঃ ইয়াসিন এবং শের আলী গাড়ির পাশে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে ধরলো ড্রাইভার!

মিঃ ইয়াসিন জীপের সম্মুখে বসলেন।

শের আলী বসলো জীপের পেছনে।

মিঃ ইয়াসিন ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—চৌধুরীবাড়ি চলো, বিশেষ জরুরি কাজ আছে।

গাড়ি ছুটলো।

মিঃ ইয়াসিন স্তব্ধ নিঃশ্বাসে বসে আছেন, ভাবছেন এমন সুযোগ মানুষের জীবনে কমই আসে—তারই পেছনে বসে আছে স্বয়ং দস্যু বনহুর যার মূল্য দু'লাখ টাকা—